কাদম্বরী

কাদম্বরী

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীভূষণভট্টের খণ্ডরচনার অনুবাদ

রেলেভিউ পাবলিশার্স
পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ নর্থ
কলিকাতা—৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক :
শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গেভিউ পাবলিশার্স
পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ নর্থ
কলিকাতা—৫

ফাল্গুন—১৩৫৭

মুদ্রাকর :—
শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ম্যাগনেট প্রেস
৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মূল্য—পাঁচ টাকা

৺পিতৃদেবের

—শ্রীপাদপদ্মে

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা



চিরাচরিত পদ্ধতিতে প্রকাশক জানিয়েছেন—লিখতে হবে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা। তথাস্তু।

কিন্তু কী লিখি। যদি আপনারা মহোদয় পি, ভি, কানের লিখিত 'কাদম্বরী'র ভূমিকা পাঠ করেন তাহলে আপনাদের বহু জিজ্ঞাসা নিমেষে শান্ত হয়ে যাবে। আমার অনূদিত 'হর্ষচরিত' (প্রকাশোন্মুখ) যদি কেউ পাঠ করেন তাহলে বাণভট্টের বংশ, সাময়িক ও সামাজিক রীতি সম্বন্ধে পূর্ণচিত্র আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। কাজেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ এবং সপ্তম শতকের পূর্ব্বভাগে যে বাণভট্ট রাজমান থেকে ভারত রাজভাষাকে ধন্য করেছিলেন এবং যুগপৎ উত্তরবর্ত্তী সাহিত্যের কুলপ্রদীপ হয়েছিলেন, যিনি শেষ আর্য্য সম্রাট পরমমাহেশ্বর মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের অনুগ্রহের দাক্ষিণ্য এবং রাজদত্ত উপাধি 'বশ্য-বাণী-কবি-চক্রবর্ত্তী' লাভ করেছিলেন—তাঁর খ্যাতি এবং প্রসিদ্ধি বিষয়ে নূতন করে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে বিবেচনা করিনা।

বাণভট্টের লেখা কয়েকখানি নাটক ও কবিতার সংবাদ প্রত্নতত্ত্ববিৎ-দের মুখে শ্রুত হই। বাণের তথাকথিত নাটকের ভাষার সঙ্গে কথা বা আখ্যায়িকার ভাষার —কষ্টগবেষণায় মাঝেমাঝে মিল পাওয়া যায়, আবার বহুস্থলেই মিল দুর্লভ। সুতরাং সে বাদানুবাদ ঐতিহাসিকদের করকমলে ন্যস্ত করেই সুখী রইলুম।

৺প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩৩৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় আমার অনূদিত কাদম্বরী সম্বন্ধে সমালোচনামুখে লিখেছিলেন, "শ্রীমান্ প্রবোধেন্দু এই সমস্ত ভাষাকে ব্যস্ত করেছেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা করেছেন; তাতে বাণভট্টের ভাষার উচ্ছ্বাস রক্ষা হয়নি। আমাদের ভাষায় গদ্যে বাণ ডাকান যায় না; সমতল বাঙ্গালা ভাষার গতি শান্ত।" আমার বোধ হয় পূজনীয় প্রমথবাবু বাণভট্টের ভাষার ধ্বনি-তরঙ্গ দেখতে পাননি, কেবল

আধুনিক যুগের শ্রুতিশৈলী নিয়ে শুনেছিলেন সমাস-তাড়িত বন্যার কলরোল। এ সম্বন্ধে পিতামহ ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪।১১।৩৬ তারিখে আমাকে যে পত্র লেখেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলুম "কাদম্বরী-কথা সংস্কৃত ভাষার সুগম্ভীর ধ্বনি-সঙ্গীতে ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে সংগ্রথিত। এই গ্রন্থে অর্থ-সূচক শব্দগুলি উপলক্ষ্য মাত্র, তরঙ্গিত ধ্বনিধারাই এর ভাবের বাহন। খাঁটী বাঙ্গালায় এর রস রক্ষা করে অনুবাদ করা আমি প্রায় অসাধ্য বলেই জানতেম।"

কাদম্বরী বিষয়ে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কয়েকখানি পত্র আমাকে লিখেছিলেন সেগুলি এই সংস্করণে প্রকাশক মহাশয় মুদ্রিত করলে সুখী হব।

১৩৫৭ সন
৩৫নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা-৬

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এতদিন পরে অক্ষুণ্ণ ভাষায় তোমার রচনাকে প্রশংসা করবার সুযোগ আমার হোলো। অনিন্দ্য নৈপুণ্যে তুমি সংস্কৃত কাদম্বরীকে বাংলার আসনে যথাযোগ্য স্থান দিতে পেরেছ—তার সম্মানের হানি হয়নি অথচ বাংলা ভাষারও সম্মান রক্ষা করতে পেরেছ। কলম এগিয়ে চলুক, মাঝখানে যাত্রা ভঙ্গ না হয় যেন।

শরীর অপটু, অবকাশ অল্প। ইতি—২৫।১।৩৬

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন।

কাদম্বরী কথা সংস্কৃত ভাষার সুগম্ভীর ধ্বনিসঙ্গীতে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে সংগ্রথিত। এই গ্রন্থে অর্থসূচক শব্দগুলি উপলক্ষ্য মাত্র, তরঙ্গিত ধ্বনিধারাই এর ভাবের বাহন। খাঁটি বাংলায় এর রস রক্ষা ক'রে অনুবাদ করা আমি প্রায় অসাধ্য বলেই জানতেম। শ্রীমান প্রবোধেন্দু এই দুরূহ অধ্যবসায়ে যে পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই প্রয়াস আদরণীয় হবে তাতে আমি সন্দেহ করিনে।

কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগের শেষ অংশে নারী-দেহের সৌকুমার্য্য বর্ণনায় যে অতিশয়োক্তি আছে, এবং তার অনতিপরেই অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে শুকসারীর যে বিবাদ বর্ণিত হয়েছে সেই পংক্তিগুলি বর্জ্জন করলে আমার মতে বাণভট্টের প্রতি সম্মান দেখান হবে। লেখক ইচ্ছা করেন যদি তবে অনুবাদ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ঐ অংশগুলি পরিশিষ্টে দিতে পারেন। ইতি—২৪।১১।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

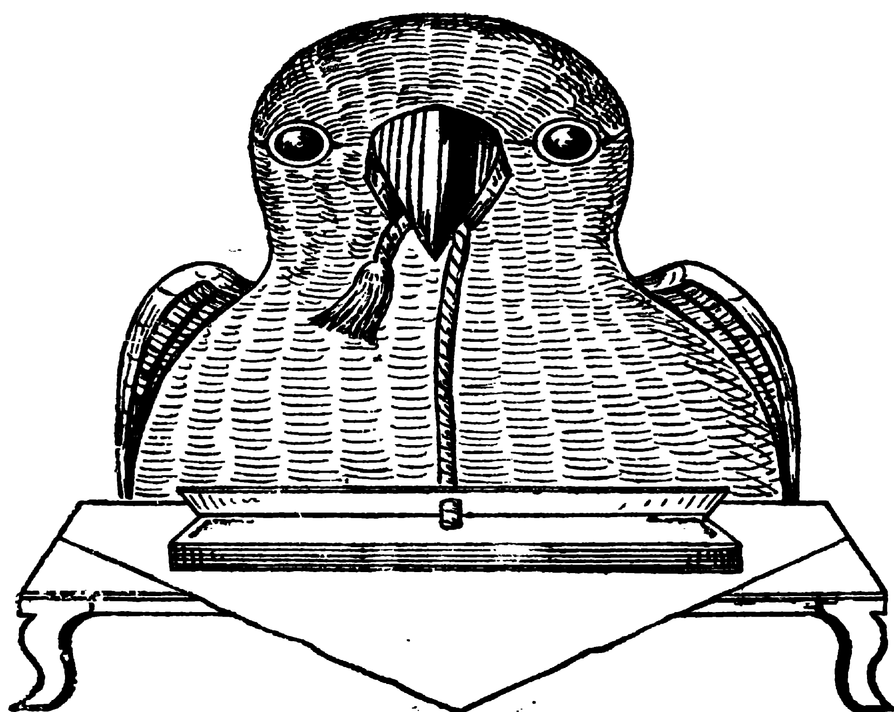
নিবেদন

কাদম্বরীকথার রচয়িতা দু'জন। শ্রীবাণভট্টের লিখিত অংশের অনুবাদ প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেছি। শ্রীভূষণভট্টের লিখিত অংশের অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ পেল। সুধীসমাজে আদৃত হলে আত্মপ্রচেষ্টাকে সফল মনে করব।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে পরিশিষ্টে সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশ নামক লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছি। কাদম্বরীকথার মূল কোথায় এবং সুসাহিত্যিকের হাতে কি লতায় কি ফুল ফোটে ও কতখানি রস ধরে, পাঠকেরা অনুধ্যান করে দেখলে সুখী হব। এই শক্তিযশলম্বকের অনুবাদরচনায় শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে আশাতীত সাহায্য করে চিরঋণী করে রেখেছেন। আমি তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি।

১লা আশ্বিন ১৩৪৫
[illegible]নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।



ভূষণভট্ট-কৃত
'কাদম্বরী'র উত্তরভাগের
কথামুখ

পার্ব্বতী এবং পরমেশ্বর—সৃষ্টির যাঁরা গুরু,
দুটি অর্দ্ধদেহের অলক্ষ্য সংযোজনায় যাঁদের গঠিত হয়েছে একটি মাত্র শরীর
তাঁদের আমি বন্দনা করি।
পূর্ণ করেন তাঁরা যেন আমার এই একমাত্র প্রার্থনা
সুদুর্ঘট (কাদম্বরী) কথার পরিশেষ-রচনায় আমি যেন সিদ্ধি লাভ করি। ১ ;

বিশ্বস্রষ্টা নৃসিংহরূপী নারায়ণকেও আমি প্রণাম করি। ২।

আমি প্রণাম করি বাগীশ্বর পিতৃদেবকে—
গৃহে গৃহে চলেছে যাঁর নিত্য অর্চ্চনা,
বহু পুণ্যের ফলে যাঁর অংশ থেকে আমি জন্মলাভ করেছি, এবং
যিনি এই অনন্যশক্য কাদম্বরীকথার স্রষ্টা। ৩।

পিতৃদেব দিব্যলোকে আরোহণ করেছেন।
তাঁর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্তি ও বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছে কথাপ্রবন্ধ।
যাঁরা রসিক তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই অসমাপ্তিতে।
অসম্পূর্ণতা দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি উত্তরভাগ রচনায়
ব্রতী হয়েছি ; কবিত্ব দর্পে স্ফীত হয়ে নয়। ৪।

পিতার গদ্যরচনার অঙ্গে আমি যে অক্ষর সন্নিবেশ করতে
সাহসী হয়েছি, তার জন্য দায়ী আমার পিতৃদেবের অনুগ্রহেরই প্রভাব।
চন্দ্রকান্তমণি দ্রব হয়—চন্দ্রমার অমৃতধারার ক্ষীণাতিক্ষীণ সম্পর্কে। ৫।

ভাগীরথীতে মিলিত হয়ে তন্-ময়তা লাভ করে অন্য নদীরা, তারপরে স্ফীত হয়
এবং শেষে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ;
আসিন্ধুগামী পিতার বচনপ্রবাহে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি মিশ্রিত
করেছি আমার বাণী। ৬।

কাদম্বরীর (অপরার্থ—মদিরা) রসভারে রসিকমণ্ডলী এত মত্ত হয়ে
রয়েছেন যে তাঁদের চেতনায় বিচারশক্তি নেই বল্লেই চলে।
সেই জন্যই পরিশেষে আমার রসবর্ণবিবর্জিত বাক্য যোজনা করতে আমি
ভীত নই। ৭ :

আমার পিতৃদেব বাণ উৎকৃষ্ট ভূমিতে কতকগুলি বীজ বপন করেছিলেন।
সমুচিত জলসেকের ফলে ফুল ধরেছিল, এবং ফুলের গর্ভে ছিল ফল।
অনায়াসে পুষ্টি লাভ করেছে, সেই ফল।
পুত্র ভূষণ কেবলমাত্র সেই বীজগুলিকে গুটিয়ে এনে ফলগুলিকে
আহরণ করেছে। ৮।

উত্তর-ভাগ

ক্ষণবিরতির পর কাদম্বরী বল্লেন —

"তারপর আরো বলি পত্রলেখা,—আমি তোর কুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।—আমার এই চঞ্চলতা, এই তরলতা আমার লজ্জাকে আরও লজ্জা দেবে। স্খলনলজ্জা দেখতে দেবে না তোর কুমারকে।. মদনের নিষ্ঠুর আঘাত—লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করে দিয়েছে আমার হৃদয়ের ভাবগুলোকে। কুমারের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবগুলো ফুটে উঠতে পারবে না, কুণ্ঠায় হার মানবে। আমার বুকে আসবে ভয়, আমার চোখে জাগবে মোহ—তারা আমাকে জড় করে ফেলবে। পারব না, আমি তোর কুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

তারপর যদি নিজে যাই---তাঁর কাছে আমার মূল্য কি কিছু থাকবে? হাল্কা হয়ে যাবে না কি আমার উপর তাঁর সম্মানের দৃঢ়তা? আর আমি যদি জোর করে তোকে দিয়ে তাঁকে এখানে আনিয়ে নিই, তাহ'লে সত্যি বলছি তোকে—অপরাধ-হয়ে-গেছে এই ভয় আমাকে এগোতে দেবে না তাঁর সামনে।"

এই কথা বলতে বলতে দেবী কাদম্বরীর কেমন যেন ভাবান্তর হতে লাগল। বাক্যের ধারাপথ গেল বদলিয়ে। বল্লেন—

"তিনি ত নাও আসতে পারেন ! গুরুজনের লজ্জা, রাজকার্য্যের অনুরোধ, সঙ্গীদের উৎকণ্ঠা, জন্মভূমির মমতা,—এরা ত বাধা দিতে পারে ! প্রিয়সখী পত্রলেখা যদি পায়ে ধরেও তাঁকে এখানে না আনতে পারে তখন আমার কি হবে !

আজ মনে পড়ে সেদিনের কুমুদিনী-সরোবরের তীর—মাতাল মধুকরের উঠছিল বাচাল গুঞ্জন, বিরহীদের দুঃখ-জাগানো কোক কামিনীদের করুণ ক্রন্দন, জ্যোৎস্নার কর্পূরশুভ্র উৎস,—

মনে পড়ে সেই ক্রীড়াশৈলের সানুদেশ—চন্দ্রকান্তমণির নির্ঝরিণীর ঝর ঝর ঝঙ্কার,—

সেই মুক্তাশিলার শয্যা—হরিচন্দনের রসকণা তার বুকে,—

আর মনে পড়ে সেদিনের সেই হিমগৃহ—পুষ্পশয্যায় শুয়ে রয়েছি—তুষারেও মিটছে না আমার দেহের দাহ।

হায় সখি, সেদিন কুমার যাকে দেখেছিলেন আমি ত সেই কাদম্বরীই, তেম্নিই আছি। যে চোখ দিয়ে কুমারকে দেখেছিলুম, সেই দুটি লোভী চোখ এখনও তেম্নি রয়েছে লোভী ; রয়েছে সেই নির্বোধ হত হৃদয়—যে, মর্ম্মকোষের মধ্যে পেয়েও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি ; সেই শরীর—যে, কাছে এলে থাকত দীনের মত উদাসীন ; সেই পাণি—যে অলীক গুরুজনের অপেক্ষায় গ্রহণ করায়নি নিজেকে। তোর চন্দ্রাপীড়ও তেম্নিই রয়েছে—দুবার এসে ফিরে গেছেন—কিন্তু বুঝতে পারেননি পরের ব্যাথা। আর সখি, তুমি যে পঞ্চশরের কথা বলছিলে—তিনিও রয়েছেন তেম্নি—আমার উপরেই শূন্য করেছেন তাঁর তূণ—অন্যের উপর তিনি নিঃস্পৃহ।"

এই কথা বলতে বলতে উদাস মলিন হয়ে গেল তাঁর মুখ। অর্দ্ধপথে ভাবের ধারাকে যেন ছিন্ন করে দিল নব-ভাবের উন্মেষ। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

ক্ষণপরে পুনরায় শুনতে পেলুম দেবী কাদম্বরীর কণ্ঠ—অতি মৃদু, অতি মধুর,—যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা সুর।

"প্রতিজ্ঞা করেছিলুম মহাশ্বেতার কাছে—'যতদিন তোমার এই দুঃখ থাকবে

ততদিন বিবাহ করব না'। আমি বার বার তাকে বলেছিলুম এই কথা। মহাশ্বেতা আমাকে কত বুঝিয়েছিল—বলেছিল 'সই, অমন কথা মনেও স্থান দিস্‌নে। ও তোর দুর্বুদ্ধি। তুই মদনকে চিনিস্‌ না—ও নিদারুণ, ক্রূর কর্ম্ম করতে ওর এতটুকুও বাধে না। প্রিয়জন অদৃশ্য হয়ে গেলেও হৃদয়কে ক্ষান্তি দেয় না; অনুরাগের আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মারে।'

অদৃশ্য! পত্রলেখা, আমার কুমার ত অদৃশ্য হয়ে যায়নি। মদন, দৈব, বিরহ, আমার যৌবন, অনুরাগ, উন্মাদনা—কে যে দায়ী আমি জানি না;—কিন্তু জনতার মধ্যেও তোর কুমার মনশ্চর হয়ে সঙ্কল্পময় রূপ নিয়ে আমার কাছে আসে, নিত্য দিয়ে যায় দেখা। সে কুমার নিষ্ঠুর নয়—সে আমাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করে যায় না। ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমার বিরহে। সে পৃথিবীর পতি নয়; রাজ্যশ্রী, সরস্বতীর কথায় সে কান পাতে না; 'কীর্ত্তি কীর্ত্তি' করে নিশিদিন থাকেনা উদ্বিগ্ন।

আমি তাকে দেখতে পাই রাত্রিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে—যখন বসে থাকি, যখন ঘুরে বেড়াই—আমার চোখচাওয়া ঘুমের মধ্যে, আমার সুপ্তিহারা স্বপ্নে—ক্রীড়াশৈলে, লীলাদীর্ঘিকায়, শিশুনদীর তীরে তীরে।

ওলো পত্রলেখা, আমার কাছে তাকে নিয়ে আসার কথা আর বলিস্‌নি।"

এই কথা বলে স্তব্ধ হলেন দেবী কাদম্বরী।

দেখি,—মুদে গেছে তাঁর চোখ, আঁখিপর্ণে টল্‌টল্‌ করছে জল—যেন অলক্ষ্য-চরণে মূর্চ্ছা এসে তাঁকে করেছে অধিকার। অন্তর্জাত দুঃখবেগ যেন তাঁকে পীড়ন করে একবারে বিলীন করে দিয়েছে।

দেখি,—পটে আঁকা ছবির মত দেবী রয়েছেন বসে;

বেদিকার বিতানতলে যে মাল্য ছিল তাতে ঢলে পড়েছে তাঁর বাহুবল্লরী;

আর তাঁর মুখখানি নীল হয়ে গেছে,—জলের আঘাত-লাগা তরুণ তামরসের ছবি।

সঙ্কল্পময় প্রিয়ের কথা—আমায় ভাবিত করে তুলল।

সত্যই ত! এই মনোবিহারী, কল্পলোকের প্রিয়ই ত বিরহিণীদের আশ্রয়! কুলবধূ, বিশেষতঃ কুমারীদেরও ত আশ্রয় ঐ সঙ্কল্পময় প্রিয়।

মিলনের আশায় পায়ে পড়তে হয় না দূতিকাদের; চলে চির-অভিসার, নিত্যমিলন, অকালরমণীয় অজস্র সৌখ্য;

মিলনে থাকে না ছল, রহস্যভরা কৃত্রিম বাধা;

আলিঙ্গনে থাকে না ব্যবধান-দুঃখ;

কেশগ্রহমহোৎসবে আকুল হয়ে ওঠে না কেশপাশ, নূপুর হয় না মুখর, শব্দহীন থাকে নিধুবন, গুরুজনদের কাছে অ-ধরা থেকে যায় অধর-খণ্ডনের বিলাস।

এই কল্পলোকের প্রিয় সূর্য্যের মত নিত্য-উদ্ভাসিত—

সে আলোককে বিদূরিত করতে পারেনা অন্ধকারের স্তূপ,

স্তম্ভিত করতে পারে না মেঘের অক্লান্ত বর্ষণ,

তিরোহিত করতে পারেনা কুহেলিকার অস্পষ্টতা।

এই রকম চিন্তা করে চলেছি এমন সময় দেখি সূর্য্য বসেছেন পাটে—অনুরাগ-কথার রস-প্লাবনে সর্ব্বশরীর যেন আরক্ত;

মনে হল কাদম্বরীর দর্শিত-রাগ হৃদয়খানি লজ্জায় সূর্য্যচ্ছলে করছে পলায়ন।

এলেন যামিনী—পল্লবশয়নের মত সন্ধ্যারাগকে রচনা করে।

এমন সময়ে অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে দীপিকাধারিণী বালিকারা দীপ হাতে দূরে দূরে মণ্ডল রচনা করে দাঁড়াল।

সেই স্নিগ্ধছটায় কাদম্বরীকে দেখতে হল অপূর্ব্ব;—যেন তিনি ফুলে ভরা হেম-পুষ্পের লতা, আর তাঁকে আক্রমণ করেছে মদনের জ্বালামুখী পুষ্পবান।

আমি তাঁকে বল্লুম—"দেবি, শান্ত হোন। কষ্ট সহ্য করবার জন্য নির্ম্মিত হয়নি আপনার দেহ। যে দাহ আপনার হৃদয়কে দগ্ধ করছে কি হবে তাকে বরণ করে? শান্ত করুন দুঃখবেগ। এই আমি চন্দ্রাপীড়কে নিয়ে এলুম বলে।"

আমার মুখ যেই গ্রহণ করেছে আপনার নাম, অম্নি দেখি দুটি নয়ন উন্মীলিত করে

দেবী কাদম্বরী আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছেন—কী স্পৃহা কী আবেগ সেই নয়নে। বিষবিহ্বলকে যেমন জাগিয়ে তোলে বিষহরণমন্ত্র—তেমনি করে দেবীকে জাগিয়ে তুলল আপনার নাম। তারপর পরিজনদের ডাক দিলেন—"এখানে কে আছিস।"

ত্বরিতপদে কন্যকারা এল।
তাঁদের দেহ ঘিরে শুভ্রবসনের উল্লাস,
দ্বারদেশ থেকে দেহ আনত করে প্রণাম করতে করতে তারা এল;
মনে হল ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের রন্ধ্র দিয়ে ছুটে আসছে মানসমুখী রাজহংসিকার পংক্তি।
তারা দাঁড়িয়ে রইল আজ্ঞার প্রতীক্ষায়।

দেবী তখন মরকতশিলাতলে উপবেশন করে বললেন

"পত্রলেখা, এখন তোমাকে যা বলব তা তোমার কাছে প্রিয় হবে না। তোমার মুখ চেয়েই আমি জীবনটাকে ধরে রেখেছি। তবু বলছি, যদি তোমার আগ্রহ থাকে তাহলে তুমি যা বলেছ তাই কর।" এই কথা বলে বরাঙ্গ থেকে উত্তরীয়খানি খুলে নিয়ে আমায় পরিয়ে দিলেন, আভরণ দিলেন, তাম্বূল।
প্রসাদসৌভাগ্যে মুগ্ধ হয়ে আমি বিদায় নিলুম।"

কাদম্বরী-সংবাদ সমাপ্ত করে পত্রলেখা নতমুখে চন্দ্রাপীড়কে ধীরে ধীরে বলল—"কুমার, দেবী কাদম্বরীর প্রসাদ পেয়ে যে প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠেছি তা নয়—অত্যন্ত দুঃখিত হয়েই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—দেবীকে এই অবস্থায় ফেলে আসা কি আপনার অনুরূপ হয়েছে? আমি জানতুম আপনি আপন্নবৎসল।"

পত্রলেখার নিবেদনের গর্ভিতার্থ বুঝতে পেরে চন্দ্রাপীড় আকুল হয়ে উঠল;—

আকুল হল পত্রলেখার স্তিমিত পক্ষ্মতলে বেদনার বিন্দুটিকে দেখে ;—আরও আকুল হল শ্রবণ করে কাদম্বরীর কোমল-কঠোর ললিতপ্রৌঢ় আলাপ।

সে আলাপ—কি গম্ভীর, কত না সন্তপ্ত !

তার মধ্যে ছিল—স্নেহ, পরিহাস, অভ্যর্থনা, অভিমান, দুঃখ, অনুরাগ, উন্মাদনা, আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া ;

সে আলাপ ছিল—মধুর অথচ দুঃশ্রব,
সরস অথচ প্রাণশোষী,
নম্র অথচ উন্নত,
পেশল অথচ অহঙ্কৃত।

পত্রলেখার মুখে কাদম্বরীর কথা শুনতে শুনতে ক্রমে চন্দ্রাপীড়ের দশা হল কাদম্বরীর মতই। কাদম্বরীর দেহ থেকে যেন দুঃখ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়।

বেপথু কাঁপাতে লাগল অধরপল্লব,
প্রাণ উপস্থিত হল কণ্ঠে, আর
অশ্রু অধিকার করে নিল দুটি নেত্র।

চন্দ্রাপীড় বলল—

"পত্রলেখা আমি কি করি বল। এ সমস্তই আমাকে লক্ষ্য ক'রে মিথ্যা-ধীর অশিক্ষিত মদনের কীর্ত্তি। সারা জগতকে কি নাচনই না নাচিয়ে চলেছেন—শৃঙ্গার নাটের গুরু! আমি ত জানতুম না আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়েই দেবী কাদম্বরীকে তিনি এতখানি ফেলেছেন বিপদে!

পত্রলেখা—জানই ত, মনোভবের কীর্ত্তির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাদম্বরীর লীলাবিলাস দেখে ভেবেছিলুম—ওসব দিব্যকন্যাদের রূপানুরূপ সহজ লীলা; সব বাদ দিয়েও আমি ভাবতেই পারিনি আমার মত লোকের উপর তাঁর চোখের আলো পড়বে ঝরে। আমি আমার উন্মাদ চিত্তকে এই বলে

বুঝিয়েছিলুম 'দিব্যকন্যাদের ঐ লীলা, ঐ অঙ্গচেষ্টা—এসব ওদের স্বাভাবিক, সহ-জাত।'

আমার মন-ভুলিয়ে-দেওয়া একি কারো অভিশাপ? তা না হলে এত সংশয়, এত সন্দেহ আসে কোথা থেকে? যার বুদ্ধি এখনও জেগে ওঠেনি সেও ত এ ক্ষেত্রে ভুল করত না; অথচ পঞ্চশরের ইঙ্গিত স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও ধাঁধাঁ লাগল আমার মনে? জানি, এমন অনেক হাসি আছে, চাহনি আছে, কথার ছল, লজ্জার আভাস,—যা অতি সূক্ষ্ম—ধরা বড় কঠিন—যার অর্থ হতে পারে অন্যরকমের। কিন্তু তাঁর-দেওয়া এই ত হার এখনও দুলছে আমার কণ্ঠে; এই হারের সঙ্গে সঙ্গে কীই বা তিনি না বলেছেন! না বলা কি কিছু ছিল? পত্রলেখা, তুমিও ত চোখে দেখেছ হিমগৃহের ব্যাপার। —অভিমানের আক্ষেপে দেবীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া অন্য কিছু বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। এ দোষ আমার, সম্পূর্ণ। প্রাণ দিয়েও আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি এত হীনপ্রাণ নই।"

এইরূপ বলে চলেছে চন্দ্রাপীড় এমন সময় বেত্রহস্তে প্রতিহারী এসে দাঁড়াল। চন্দ্রাপীড় এত উন্মনা ছিল যে শুনতে পেল না প্রতিহারীর পদধ্বনি।

অবশেষে

প্রতিহারী প্রণাম করে নিবেদন করল—

"যুবরাজ, মহাদেবী আদেশ করছেন—'শুনতে পেলুম, পত্রলেখা আজ ফিরেছে। জান ত, তোমায় আর পত্রলেখাকে ভিন্নচোখে কখনও দেখিনি। পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এস। বহুক্ষণ হল তোমাকে দেখিনি। তোমার মুখ দেখলে আমার মনে হয়—মনের সব আশা বুঝি মিটল।"

প্রতিহারীর মুখে জননীর কথা শুনে চন্দ্রাপীড় চিন্তিত হয়ে পড়ল কি করা বিধেয়! দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিক্ষত হল তার চিত্ত।

এদিকে জননী,—মুহূর্ত্তের অদর্শন তাঁর সয়না।

ওদিকে কাদম্বরী,—নির্নিমিত্ত অকুণ্ঠিত তাঁর ভালবাসা।

হৃদয়—কামনাব্যাকুল।

একদিকে—প্রমাথী মন্মথহতক, সুদুঃসহ উৎকণ্ঠা,
অন্যদিকে—বান্ধবদের প্রীতি, জন্মভূমির আকর্ষণ।
এর পরে কাদম্বরীকে বিবাহ না করা পাপ।
চঞ্চল হৃদয়ের বিলম্ব আর সয় না।
হেমকূট আর বিন্ধ্যাচলের ব্যবধান বড় দূর।

চিন্তার ভিতর দিয়ে পত্রলেখার বাহুতে বাহু রেখে প্রতিহারীর দর্শিতপথে ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড় জননীর নিকট উপস্থিত হল।
কিন্তু জননীর লালনসুখের আতিশয্যেও নিশ্চিন্ত হল না চন্দ্রাপীড়ের মন।

ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড়ের সত্তার এক উৎকট পরিণতি ঘটতে লাগল। কামনাজর্জর চিত্তে যতই হয়—অদ্ভুত স্বপ্নের বিলাস, গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত, দুর্বিনীত চিন্তার উত্থান, ততই হতে থাকে পারিপার্শ্বিক জ্ঞানলোপ।
চারিদিক অন্ধকার করে রাত্রি আসে; চন্দ্রাপীড় ভাবে—তার হৃদয়ের কালিমায় কালো হয়ে গেছে শর্বরী।
নদীতীরে অনিবার্য-বিরহবেদনায় কেঁদে বেড়ায় চক্রবাক চক্রবাকী; চন্দ্রাপীড়ের মনে হয়—ও তারই হৃদয়ের করুণ আর্তধ্বনি।
অঙ্কোল্ল-ধূলির মত ধূসরালোক ওঠেন চন্দ্রদেব; চন্দ্রাপীড় ভাবে—ঐ তপ্ত কিরণগুলি উত্তেজিত স্মরশর।

নিদ্রাবিনোদহীন শয্যায় রাত্রি কাটে চন্দ্রাপীড়ের।
চন্দ্রাপীড় স্বপ্ন দেখে।
দেখে, কাদম্বরীর অনিন্দ্যরূপ—কন্দর্পের যেন শ্রীনিকেতন।
চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় ঠিক থাকতে পারে না। সে হৃদয়—

কাদম্বরীর চরণপল্লবের ছায়াতলে ক্ষণকাল করে বিশ্রাম; নাভিমুদ্রায় থাকে মগ্ন; উল্লসিত হয়ে ওঠে রোমরাজিতে; আরোহণ করে ত্রিবলির সোপানপথে; ধরে থাকে থর-থর-কম্পিত হাতখানি; জড়িয়ে থাকে গ্রীবা; উৎকীর্ণ থাকে

অধরপুটে; গাঁথা হয়ে যায় নাসার বেশরে; চিকুরতিমিরে থাকে তারা হয়ে; দিক্‌প্লাবিনী লাবণ্যের স্রোতস্বিনীতে করে স্নান।

একটি দুটি করে এমনি করে চন্দ্রাপীড়ের দিন কাটে।

সারাদিন চোখে জল—পুষ্পধনুকে বারম্বার ভৎ‍র্সনা করে বলে "নির্দ্দয়, অম্লান মালতীফুলের মত যে কোমল, তাকে বিঁধতে তোমার লজ্জা হয় না!"

তারপর চন্দ্রাপীড়ের মনে হয়—বাণের আঘাতে বুঝি কাদম্বরী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন। সে কাদম্বরীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গে—চন্দ্রাপীড়ের স্বেদজলের ধারায়, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে। সংজ্ঞা ফিরে এলে চন্দ্রাপীড়ের আনন্দ যেন আর ধরে না; সর্ব্বক্ষণ দেহে ফুটে থাকে রোমাঞ্চ।

"এত ব্যথা কি সহ্য করতে পারে তার হৃদয়?"—এই খবরটুকু নিয়ে আসবার অভিপ্রায়ে চন্দ্রাপীড় নিজের হৃদয়কে দেয় পাঠিয়ে; শূন্যতার উপর নির্ভর কোরে উত্তর পাবার আশায় সারাদিন থাকে মৌন।

•

সব অবকাশ, সমস্ত ব্যবধান পূর্ণ কোরে ঝলমল্ করতে থাকে কাদম্বরীর মুখ।

আর কি কিছু চোখে পড়ে? আর কি ভাল লাগে জ্যোৎস্নার মৃদু জ্যোতিঃ? যে ভাগ্যবানের সঙ্গে প্রিয়ার নিত্য আলাপ চলে তার কানে কি অন্যধ্বনি পৌঁছয়? সেখানে কি স্থান পায় বীণার ললিত ঝঙ্কার, বন্ধুদের সুখজল্পনা?

কাদম্বরী-চিন্তায় পাছে ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে চন্দ্রাপীড় সকলের কাছে থাকত অদৃশ্য।

আবার এদিকে গুরুজনের লজ্জা।

সমস্ত শরীর দগ্ধ হচ্ছে বিরহানলে, তবু কি শয়ন করা যায় সদ্য তুলে-নিয়ে-আসা সিক্ত অরবিন্দের শয়নে? কেমন করে অঙ্গে রাখা যায় মৃণালের সরসতা? লজ্জা হয় ধারাগৃহে যেতে।

লতাগৃহ—যেখানে ঝুম্‌ঝুম্ করে অবিরত ঝরে মকরন্দ,

মণিকুট্টিম—যার চন্দনরসলুলিত পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত হতে চায় সারা দেহ, সেথায় যাওয়া কি সহজ কথা ? লোকে কি বলবে ? পুরুষ মানুষের এ সব কি শোভা পায় ? অধিক কি আর বলব—হরিচন্দনের রসচর্চ্চায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল তার পাদপঙ্কজ।

এম্নি করে মানসিক অসুস্থতার ভিতর দিয়ে চন্দ্রাপীড়ের দিন কাটতে লাগল, রাত্রি।

কে জানত পুষ্পতনুর মধ্যে রয়েছে এত জ্বালা, এত আগুন !

দহনাত্মক দেহ নয়, তবু এযে জ্বালিয়ে মারে

স্নেহরস বা ইন্ধন নেই তবু হৃদয়কে করে দেয় দগ্ধ

ভস্ম করেনা কিন্তু অনুভব করিয়ে ছাড়ে নিত্য দুঃখ।

চন্দ্রাপীড়কে অন্তরে বাহিরে দগ্ধ করে শুষ্ক করে দিতে লাগল এই অনল ; কিন্তু তার দেহকে পরিত্যাগ করল না—প্রতিদিন-বর্দ্ধমান কাদম্বরীর অনুরাগ-রসের লাবণ্যময়ী আদ্র´তা।

মনসিজের এত উপাসনা সত্ত্বেও লোকচক্ষু থেকে নিজের অবস্থাকে গোপন করে রাখবার চেষ্টা করত চন্দ্রাপীড়।

দেহ ক্ষীণ হল কিন্তু ক্ষীণ হল না লজ্জা ;

শরীরস্থিতিতে ঘটল অনাদর, কিন্তু অনাদর ঘটলনা কুলস্থিতিতে ;

হৃদয়ের আনন্দ অবজ্ঞা করল সুখকে, কিন্তু পারলনা ধৈর্য্যকে করতে অবজ্ঞা।

গম্ভীর-প্রকৃতি সমুদ্র চান্দ্রিক আকর্ষণে উল্লসিত হয়ে উঠেও যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে যায় না তেম্নি হল চন্দ্রাপীড়ের দশা।

এমনি করে একটি একটি করে দিন কাটে, আর চন্দ্রাপীড়ের মনে হয়—এক এক যুগ যায়।

সেদিন হৃদয়ের গাঢ় উৎকণ্ঠা চন্দ্রাপীড়কে আর শ্রীমণ্ডপে থাকতে দিল না বিষ-ঢালা যেন প্রাসাদের রুদ্ধ বাতাস।

চন্দ্রাপীড় বিচরণ করতে লাগল শিপ্রানদীর তীরে।

শিপ্রার সুকুমার সৈকতভূমি আক্রান্ত ছিল কলক্বণিত হংস আর চক্রবাকের চক্রবালে,

তরঙ্গচুম্বি হিমবায়ুতে ছিল মন্থর।

এমন সময় চন্দ্রাপীড়ের চোখে পড়ল—একদল অশ্বারোহী দূর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে চলেছে প্রাসাদের দিকে।

সেই তুরঙ্গপংক্তি কখনও হচ্ছে মিলিত, কখনও পৃথক; কখনও তাড়িত হয়ে গ্রীবা আস্ফালন করে লম্বিত করছে দেহ, কখনও অবসাদে হচ্ছে স্খলিত-পদ। তাদের ত্বরিত গতির ভঙ্গী চন্দ্রাপীড়কে জানিয়ে দিয়ে গেল কার্য্যের গৌরব।

কুতূহলী চন্দ্রাপীড় আদেশ করল প্রহরীকে—"অশ্বারোহীরা কোথা হতে আসছে সংবাদ নাও।"

তারপর শিপ্রার উরুদঘ্ন জল পদব্রজে অতিক্রম করে ভগবান কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে দাঁড়াল সংবাদের প্রতীক্ষায়। সেখানে পত্রলেখার হাতে হাত রেখে তুরঙ্গবৃন্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—"পত্রলেখা, বলত, ময়ূরপুচ্ছের বঙ্কিকার নীচে ঐ যে অশ্বারোহী আসছে,—ভাল করে দেখা যাচ্ছে না যার মুখ—ও কি আমাদের কেয়ূরক?"

চেনা যায়, চেনা যায় না।—

প্রহরীর সঙ্গে দু একটি কথা বলে অশ্বারোহী অবতরণ করল অশ্ব থেকে।

দূর থেকে দেখা গেল ধূলায় ধূসর হয়ে গেছে অশ্বারোহী। শ্যামীকৃত তার শরীর। সারাদিন পথশ্রমে দেহে হয়নি অঙ্গরাগ—তাই কেমন যেন তাকে অসংস্কৃত মলিন দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে অশ্বারোহীকে চেনা গেল—

হ্যাঁ কেয়ূরকই ত!

হর্ষভরে চন্দ্রাপীড় দুটি বাহু প্রসারিত করে সম্ভ্রমনত কেয়ূরককে দিল আলিঙ্গন।

কেয়ূরকের সঙ্গীদের অনাময়-প্রশ্নে মুগ্ধ করে কেয়ূরকের দিকে সস্পৃহ দৃষ্টি ফেলে চন্দ্রাপীড় ক্ষণপরে বললে—

"কেয়ূরক, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে দেবী কাদম্বরী আর তাঁর পরিবারবর্গ বেশ ভালই আছেন। এখন একটু আরাম কর, তারপর জানিও তোমার আগমনের হেতু।"

কেয়ূরক বলল—"আমার মত লোকের আবার আরাম।"

মাহুত করিণীকে নিয়ে এল।

চন্দ্রাপীড় কেয়ূরক আর পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল স্বভবনে। শ্রীমণ্ডপে এসেই চন্দ্রাপীড় নিষেধ করে দিল রাজলোকের প্রবেশ। দিবসকৃত্য সমাধা করে তপ্তচিত্ত নিয়ে প্রবেশ করল বল্লভোদ্যানে; সমস্ত পরিজনকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পত্রলেখা-দ্বিতীয় কেয়ূরককে জিজ্ঞাসা করল—

"কেয়ূরক, বল, দেবী কাদম্বরী, মদলেখা, আর্য্যা মহাশ্বেতার কি খবর?"

চন্দ্রাপীড়ের প্রশ্ন শুনে কেয়ূরক প্রশ্রয়ভরে মাটিতে উপবেশন করে বলল—

"দেব, কি আর খবর দেব? দেবী কাদম্বরী, মদলেখা, আর্য্যা মহাশ্বেতা—আপনার কাছে নিবেদন করবার জন্য কোনো খবরই দেন নি।

মেঘনাদের হাতে পত্রলেখাকে সমর্পণ করে গন্ধর্ব্বলোকে ফিরে এসে—'আপনি উজ্জয়িনী চলে গেছেন'—এই সংবাদ নিবেদন করতেই আর্য্যা মহাশ্বেতা আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আহতের মত একবার বলেছিলেন—

'তাহ'লে চন্দ্রাপীড় চলে গেছে!'

তারপর—সারাদিন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি একটি অক্ষর। তপস্যার জন্য—অচ্ছোদ সরোবরের তীরে নিজের আশ্রমে চলে যান।

আর দেবী কাদম্বরী!—

অকস্মাৎ তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হল!

মানসীব্যথায় মুদে এল তাঁর চোখ,

যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন,

কে যেন তাঁকে বঞ্চনা করে সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে,—এম্নিতর ভাব জানতেও পারলেন না—মহাশ্বেতা চলে গেছেন।

ক্ষণকাল এই ভাবে থেকে নয়ন উন্মীলন করে বসে রইলেন—বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি, লজ্জিত নয়নে যেন দিশা নেই। তারপর ঈর্ষ্যাভরে বলেছিলেন "তোরা একবার মহাশ্বেতাকে বলিস্।" মদলেখার দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে অধরের কোণে হাসির রেখা টেনে বলেছিলেন—"মদলেখা, তোদের কুমার অদ্বিতীয়।"

এই বলে সেখান থেকে উঠে চলে যান শয়নাগারে। শয্যায় উপুড় হয়ে উত্তরীয়প্রান্তে মুখখানি গুণ্ঠিত করে সারাদিন পড়ে রইলেন। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করল না। মদলেখার সঙ্গে একটা কথাও তিনি কইলেন না।

তার পরের দিন আমি তাঁর কাছে গেলুম। তিনি কোনো কথা বলতেই পারলেন না। কিন্তু আমার মনে হল তাঁর জলভরা চোখ আমাকে—এই সুদৃঢ়দেহ আমাকে—যেন ভৎর্সনা করছে ; যেন বলছে—

"তোমরা আমার কাছে কাছে ফির না, আমার প্রয়োজন নেই তোমাদের। এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ, যাও।"

দেবীর কষ্ট দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি। ভৎর্সনাচ্ছলে আপনার কাছেই যেন আমাকে যেতে বলেছেন এই অছিলায়, দেবীকে না জানিয়েই আপনার পদ-প্রান্তে উপস্থিত হয়েছি।

কুমার, আপনিই একমাত্র আমার দেবীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, ইচ্ছা করলে ধ্বংসও করতে পারেন।

আমি এইমাত্র বলতে পারি—দেবীর যে কি কষ্ট হয়েছে সে কথা শুনলে আপনি স্থির থাকতে পারবেন না।

নববসন্তের মত যেদিন—প্রথম আপনি গন্ধর্ব্বলোকে এসে উপস্থিত হন সেদিন চন্দনের সুরভিস্নিগ্ধ বসন্তসমীরের আঘাতে সমস্ত কন্যকা-লতাবন দুলে উঠেছিল, আর অশোকমঞ্জরীর সঙ্গে সঙ্গে আমার দেবীরও মনে কন্দর্পের প্রসন্নতা ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অনুরাগের মঞ্জরী। আর আজ, আমি যখন তাঁকে রেখে চলে আসি তখন আমার মনে হল সে মঞ্জরী ধূলায় পড়ে কাঁদছে।

কন্দর্পের আগুন অবিরাম জ্বলছে আমার দেবীর দেহে—সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যকান্ত-মণির আগুন যেমন জ্বলে—শব্দহীন, ধূমহীন, ভস্মহীন, বায়ুতে অনির্ব্বাণ ; সখীরা ধীরে ধীরে তাঁকে বীজন করে আর্দ্র তালবৃন্তের জড়-কণিকা ছড়িয়ে—সে অনল নেভে না ;

বৃথাই করা হয় বিদলিত মুক্তাফলের চূর্ণক্ষেপ—সে আগুন তেমনই থাকে ধ্বংসহীন ;

যন্ত্রবিগলিত অতিশিশির বারিধারায় যতই তাঁকে আঘাত করি ততই জ্বলতে থাকে বৈদ্যুতানল-সহোদর এই মদনপাবক ;

যতই করি উপচার ততই ফুটে ওঠে কুন্দকলির মঞ্জরীর মত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। কিন্তু কুমার, আশ্চর্য্য ! বিরহানলে এত দগ্ধ হয়েও অগ্নিশৌচ অংশুকের মত দিন দিন তাঁর লাবণ্য নির্ম্মল হয়ে উঠছে।

আমার মনে হয় হৃদয়-ব্যাপারে প্রথমে আসে অনুভব, তারপরে আসে বেদনা ;—এই বেদনা প্রাণকে বিহ্বল কোরে বিনাশ করবার শক্তি রাখে, যদি না তার শত্রু হয় মিলনের দুর্দ্দমনীয় আশা।

কুমার, এ কথা আমি কাকে বোঝাব, কী করেই বা বোঝাই ! আমার দেবীর বেদনা থাকেনা একমাত্র উৎকণ্ঠা-স্বপ্নে, সেখানে আপনি থাকেন প্রতিদিন দৃশ্যমান, আর আপনার কাছে দেবীর এই দশাও থাকে অদৃশ্য।

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে যে কমল, সেই কমল দিয়ে শয্যা রচনা করে দি,—শেষে দেখি দেবীর তনুখানি তবুও যেন তাপে কেমন মলিন হয়ে গিয়েছে। নিষ্করুণ অকারণক্রূর অনঙ্গ তাঁকে দিয়ে যা করাচ্ছেন তাই তিনি করে চলেছেন—নির্ব্বিচারে।

সখীরা যখন তাঁকে কুসুমশয্যায় শুইয়ে দেয়—তখন তিনি বলে উঠেন "আমার কঠিন হৃদয়ে তুমি কেমন করে শয়ন করে আছ ?"

বিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তাঁর দশা।

পঞ্চশরের খর বাণের হিংস্র আঘাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার অভিপ্রায়ে

কবচের মত তাঁর অঙ্গে ফুটে থাকে আপনারই অনুস্মরণ-রোমাঞ্চ!

রোমাঞ্চিত হৃৎ পদ্ম থেকে প্রতিশ্বাসে যে অংশুকখানি গলে পড়ে, দক্ষিণ করকমল দিয়ে যখন সেখানিকে তিনি ধরে থাকেন তখন মনে হয় আপনারি পাণি-গ্রহণের তৃষ্ণায় দক্ষিণ হাতখানি বুঝি গ্রহণ করেছে কণ্টক-শয্যার ব্রত!

কপোলতলে রেখে রেখে পদ্মরাগমণির বলয়-পরা বামহাতখানি যখন অবশ হয়ে ঢলে পড়ে, যখন তিনি হাতখানিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভেঙে দিতে চান অঙ্গুলির জড়তা, তখন সেই কম্পিত হাতখানিকে দেখে আমার মনে হয়—একটি পদ্ম যেন বিরহ-হুতাশনে জ্বলছে!

হিমজল হাতে নিয়ে সখীরা যখন তাঁর তপ্ত অঙ্গখানির সেবা করে তখন তাঁর অসহ্য বলে বোধ হয় সেই হিমবারির উপচার;—লীলাকমলের মালিকা যেমন সহ্য করতে পারেনা শিশিরের আর্দ্র আঘাত।

মেখলা খসে পড়ে পায়ে;

ললাটফলকে চন্দনের লেখা;

অংসে বেণী;

আর কণ্ঠে প্রাণ।

শুধু মিলনের আশায় তিনি হৃদয়খানিকে ধরে আছেন,

হৃদয়ে—আপনাকে,

আর সেই হৃদয়ের মাঝখানে আপনাকে দেখতে পাবার লোভে নিত্য কামনা করছেন—হৃদয় যাতে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

লজ্জা দেয় তাঁকে তাঁর বেঁচে থাকা—যেমন লজ্জা দেয় ভুল করে আপনাকে নাম ধরে ডাকা।

কখনও দেখি পবনপ্রেঙ্খোলিত লতামণ্ডপে তিনি বসে রয়েছেন—

কখনও দেখি স্থল-কমলিনীর কাননে—

কখনও দেখি উপবন-সরোবরে স্নানে নেমেছেন;—জলে পড়েছে রোদন-তাম্র নয়নের ছায়া; দেখতে পেলুম জলের তলায় মুখ লুকিয়ে দুটি রক্তকমল কাঁদছে!

সেখান থেকে তিনি দ্রুতপায়ে চলে গেলেন তমাল-বীথিতে।

তারপরে সঙ্গীতগৃহে, তারপর মধুর মুরজ-রবোদ্বেজিত ময়ূরীর মত চলে গেলেন মুক্তধারা ধারাগৃহে। সেখান থেকে বর্ষণপুলকিত নীপকলিকার মত কম্প্রদেহে চলে গেলেন অন্তঃপুরের কমলদীর্ঘিকার তীরে।

সেখানে অসহ্য বলে বোধ হল কলহংসের কাকলী। পাছে নূপুরধ্বনি শুনতে পেয়ে কলহংসেরা ছুটে আসে—সেই ভয়ে তিনি খুলে ফেলে দিলেন চরণের নূপুর। নূপুরহীন পায়ে বসে রইলেন ভবনবাপীর তীরে। বলয়িত মৃণালগুলিকে ম্লান দেখে চীৎকার করে উঠল চক্রবাকী। অসহ্য বোধ হল তাদের কূজন।

শেষে ফিরে গেলেন সেই প্রমোদবনে।

ক্রুদ্ধ ভ্রমরেরা অভিযোগ নিয়ে ছুটে এল—পুষ্পশয্যায় মর্দ্দিত হয়েছে তাদের পুষ্পসঞ্চয় ;

ভালো কি লাগে তাদের গুঞ্জন ?

মদনের এ হেন বর্ব্বরতায় কষ্টে কেটে যায় তাঁর দিন।

আসে চাঁদিনী রাত্রি !

চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্যও লোপ পেয়ে যায়।

ব্যথিয়ে উঠে হৃদয়-কমল।

কুমুদদলের সঙ্গে সঙ্গে মকরকেতনের হয় পুনর্বার আবির্ভাব।

চন্দ্রকান্তমণির মত দুটি নয়ন থেকে ঝরতে থাকে অশ্রু; সাগরের মত স্ফীত হয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস; আর চক্রবাক চক্রবাকীর মত—মতিচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় অপূর্ণ যত মনস্কাম, চিন্তারাক্ষসীর ক্লিষ্ট ধ্বংসাবশেষ।

হায় কুমার, স্বেদ-প্রতিকারের জন্য ধীরে ধীরে যখন কর্পূরচর্চ্চা করি, তখন মনে হয় দেবীর ক্ষীণাতিক্ষীণ দেহ থেকে ঝরে পড়ছে দগ্ধ কন্দর্পের ভস্ম।

সেদিন মৃদঙ্গধ্বনি শুনতে শুনতে তাঁর মনে হল ময়ূরেরা কেকাধ্বনি করছে;—অমনি ছুটে চল্লেন ধারাগৃহে;—দেখি মরকত-ময়ূরগুলির মুখগুলিকে

চেপে ধরে বসে রয়েছেন। আমরা ত বুঝতে পারিনে—এটাকি তাঁর মুগ্ধতা, না বিলাস, না উন্মত্ততা।

সেদিন দেখি—তখন দিন শেষ হয়ে আসছে, ছবিতে—আঁকা এক জোড়া চক্রবাক আর চক্রবাকীকে মৃণালের সূতো দিয়ে বেঁধেছেন! আমাদের ত মুখে কথা নেই; শেষে তিনি বললেন—"জানিস্‌নে, রাত্রি ওদের মধ্যে আনে বিরহ।"

পুষ্পশয্যায় বসে বসে মিলনধ্যানে বিহ্বল হয়ে মণিদীপগুলিকে নিবিয়ে দেন কর্ণোৎপলের তাড়নায়; একেবারে আত্মহারা! উৎকণ্ঠাপত্রিকায় লিখে পাঠিয়ে দেন সঙ্কল্পে সমাগমের অভিজ্ঞান!

দক্ষিণপবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন গন্ধ আসে চন্দনের—তেম্নি আসে এঁর মোহ;

নিশার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছুটে আসে চক্রবাকদের অভিশাপ তেমনি আসে এঁর রাত্রিজাগার ভয়;

বলভীকপোতের কূজনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফিরতে থাকে প্রতিধ্বনি তেমনি হয় এঁর দুঃখের আবির্ভাব;

আর পুষ্পগন্ধে অন্ধ হয়ে যেমন ধেয়ে আসে কৃষ্ণনীল ভ্রমরের দল তেমনি ধেয়ে আসে এঁর মরণের অভিলাষ।

কুমার! সে দেবীকে আপনি দেখেননি। টল্‌মল্ করে কাঁপছে তাঁর জীবন—পদ্মিনীপলাশের উপর যেন জলের একটি বিন্দু।

উপদেশ দিতে দিতে সখীদের বাক্‌চাতুরী নিঃশেষ হয়ে এসেছে; শয্যাপরিকল্পনায় এত কুসুম নষ্ট হয়ে গেছে যে উপবনে নেই বল্লেই চলে ফুল;

বলয় গড়ে গড়ে সখীরা প্রায় শেষ করে এনেছে গৃহকমলিনীর মৃণাল; আর কন্দর্পের বেদনা সহ্য করে ক্ষীণ হয়ে গেছে দেবীর অঙ্গ।

অধিক কি আর বলব!

দেবী এখন সখীদের—আপনারি নাম ধরে ডাকেন;

রহস্যালাপের মূলে—আপনিই রয়েছেন অচঞ্চল ;
কন্যকাপুরের একমাত্র চিন্তা—আপনাকে কেমন করে ফিরে পাওয়া যায় ;
পরিজনদের মধ্যে যা কিছু কথাবার্ত্তা চলে—আপনিই তার কেন্দ্র।

মাগধীদের মঙ্গলগীত-তাতেও রয়েছে আপনাকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ;
চিত্রকলার অভ্যাস— আপনারই মূর্ত্তির কল্পনায়।
যখন স্বপ্নকথা ওঠে, তখন শুনতে পাই—আপনি স্বপ্নে দিয়ে গেছেন দেখা ;
আর যখন সংজ্ঞালোপ হয় তখন আপনারই নামমন্ত্র জপ করে ফিরিয়ে আনতে হয় জ্ঞান ...।"

হঠাৎ কেয়ূরককে বাধা দিয়ে অনুকম্পাবশতঃই যেন মূর্চ্ছাদেবী নয়নমুদ্রণের ছলে "কেয়ূরক, থাক্ থাক্ —আর শুনতে পারছিনা"—এই কথা বলে চন্দ্রাপীড়কে করলেন আক্রমণ। কেয়ূরকের মুখে কাদম্বরীর অবস্থা-নিবেদনের যে পরিসমাপ্তি ঘটেছে—এই আক্রমণ তার কারণ নয়।

পরক্ষণেই—"কাদম্বরীর তবে কি হবে" এই কথা মনে হতেই যেন দেবী নিয়তি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন চন্দ্রাপীড়ের সংজ্ঞা, ভেঙ্গে দিলেন তার মূর্চ্ছা ; সম্ভ্রমনত কেয়ূরক আর তালবৃন্ত-বাহিনী পত্রলেখা হল উপলক্ষ।

দারুণ অপরাধ করে ফেলেছে—এই ভয়ে কেয়ূরক এতকাল একান্তে ছিল দাঁড়িয়ে—লজ্জিত, বিমূঢ় ;—এখন চন্দ্রাপীড় তাকে আহ্বান করে স্খলিত-অক্ষর বাষ্পসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল

"কেয়ূরক এখন বুঝতে পারছি—কেন দেবী কাদম্বরী আমার কাছে আসবার জন্যে তোমাকে আদেশ করেননি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন—আমার হৃদয় বড় কঠিন, এ হৃদয়ে জন্ম হয় না অনুরাগের, আমার ফিরে যাবার সম্ভাবনাও বড় দূর। এখন বুঝছি আর্য্যা মহাশ্বেতাই বা কেন ছিলেন নীরব, মদলেখাই বা কেন সংহার করেছিল তার অনুরোধ।

কিন্তু কেয়ূরক, পত্রলেখা ত আমার বিষয় তাঁকে সমস্তই জানিয়েছিল। তোমার দেবী নিজেকে নিজেই হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারেননি, চেনেন না।

এতটুকু যদি আভাস দিতেন! কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? তাঁর হৃদয় বড় স্নিগ্ধ, বড় উদার, বড় অভিজাত।

চন্দ্রমূর্ত্তির আবির্ভাবে আর্দ্র-পর্য্যন্ত হতে পারে নিশ্চেতন চন্দ্রকান্ত পাষাণ, কিন্তু করস্পর্শ করা কি তার আয়ত্তের অধীন?

নিতান্ত পক্ষপাতী মধুকর উড়ে গিয়ে বসতে-পর্য্যন্ত পারে পুষ্পকলিকায়, কিন্তু যতক্ষণ না পুষ্পকলিকা সদয় হয়ে নিজের দলগুলিকে মেলে ধরে ততক্ষণ কোথায় তার মকরন্দলাভ?

সূর্য্যতাপে ক্লান্ত হয়ে কুমুদগুলিকে দেখেছি উন্মুখ হতে, কিন্তু তাদের প্রস্ফুটিত করতে হলে প্রয়োজন হয় জ্যোৎস্নাভিরামা রজনীর।

পাদপের মধ্যে রস আছে—এ খবর সকলেই জানে—কিন্তু পাতায় রং ধরান অপেক্ষা করেনা কি বসন্ত-লক্ষ্মীর?

কেয়ূরক, কেউ যদি অপরাধ করে থাকে, বলব, অপরাধ করেছে দেবী কাদম্বরীর 'আজ্ঞা';—আমি ত সামনে ছিলুম দাঁড়িয়ে—অধরস্পন্দনের অপেক্ষামাত্র করে সামনে দাঁড়িয়েছিল এই চিরদাস—তবে কেন সেই আজ্ঞা……দেবীর জীবন-সংশয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করে আশ্রয় নিল লজ্জাদেবীর? লজ্জা—সে ত কেবল দুঃখ দিতেই জানে,—সে ত কেবল সুখের পথে কণ্টক হয়েই দাঁড়ায়! তার উপর সেখানে ত দেবীর পরিজনেরা ছিল দাঁড়িয়ে, তাদেরও ত উচিৎ ছিল একটা কিছু করা।. তাদেরই বা কেন এমন ধারা ভুল হল?

যে দাস চরণে বাঁধা, তাকে দেখে এ কি রকমের লজ্জা, হৃদয়ের উপর এ কি রকমের নিদারুণ অবিশ্বাস এল,—যে আমার মনোরথ ত পূর্ণ হলই না, মাঝখান থেকে কষ্ট দিলেন নিজের শিরীষফুলের চেয়েও কোমল অঙ্গটিকে।

অথবা—এও হতে পারে—নিজেকে নিজে লুকিয়ে রাখা মেয়েদের একটি স্বভাব; বিশেষতঃ যাঁদের কিশোর ভাব সম্পূর্ণ যায়নি!

সখী মদলেখা—সে দেবীর দ্বিতীয় হৃদয়—সেখানে ছিল;

যখন দেখল যে পঞ্চশর আক্রমণ করেছে তার সখীকে,

যে পঞ্চশর—দুর্ব্বার,

যে পঞ্চশরের হাত থেকে সংযমধন ঋষিরাও হৃদয়কে রক্ষা করতে অসমর্থ,

যে পঞ্চশরের স্পর্শ শুচিদেরও অপরিহার্য্য, যে চণ্ডালকে দূর করে দেওয়া যায় না, নেভানো যায় না যে শ্মশান-আগুনকে,

যে পঞ্চশর ব্যাধির সৃষ্টি না করেই হরণ করে নেয় রূপ—

সেই পঞ্চশরের রূঢ় অভিযান দেখেও তখনই কেন মদলেখা তৎপর হল না? আমি ত সেখানে ছিলুম; আমাকে ত একটু বোঝাতে পারত আভাসে, অস্পষ্ট কথায় একটি পটু ইঙ্গিত।

এখন আমি কি করতে পারি? পথে পথেই কেটে যাবে দিন। এদিকে দেবীর শরীর—সে ত বজ্রের মত কঠিন নয়—যে নিত্য সহ্য করবে দুর্বিষহ পুষ্পধন্বুর শরক্ষেপ! প্রতিপলকে যে কি ঘটছে তাই বা কেমন করে জানব!

তার উপর চারিদিকে যে রকমের প্রচণ্ড সমারম্ভ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে—এত করেও দুর্ঘটনা-পণ্ডিত বিধাতা বোধ হয় এখানেই নিরস্ত হলেন না।

নিরস্তই যদি হবেন তাহলে—

কেনই বা আমাকে কিন্নরমিথুনের পিছনে পিছনে ছুটিয়ে আনলেন—নির্মানুষ অরণ্যে,

তৃষ্ণার্ত্তকে দেখালেন অচ্ছোদ সরোবর,

তীরে বিশ্রাম করছি—সেখানে শোনালেন অপূর্ব্ব অমানুষিক গীত,

কেনই বা দেখালেন মহাশ্বেতাকে তমালিকাকে, আনলেন হেমকূটে —দেখালেন কাদম্বরী,

অনুরাগের আবীর ছড়িয়ে রাঙিয়ে দিলেন চিত্ত,

আর সর্ব্বশেষ কেনই বা আনলেন সুদূর উজ্জয়িনী থেকে পিতার অলঙ্ঘনীয় আদেশ।

কর্ম্মফলের যিনি নিয়ন্তা সেই দগ্ধবিধিই অনেক উঁচুতে উঠিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েছেন—কোথায়, আজ কে জানে, শুধু এইটুকু জানি, কেয়ূরক,—দেবীর জন্যে আমাকে একটা কিছু করতেই হবে।”

চন্দ্রাপীড় যখন এই রকমের কথা বলে চলেছে তখন গলিত-স্বর্ণের মত পিঙ্গলদ্যুতি

সূর্য্যদেব—"কাদম্বরীর কথা যাকে এতখানি সন্তাপিত করে রেখেছে তাকে আর কেন আত্মতেজে অধিকতর তপ্ত করা"—এই কথা মনে করেই যেন সদয় হয়ে দিগ্বিকীর্ণ ধূর্জ্জটির জটার মত নিজের সহস্ররশ্মিকে করলেন সংহার।

ক্রমে শেষ হয়ে এল দিন।

শৈবালবর্ণের মত ভ্রাম্যমাণ তিমিরলেখা ধীরে ধীরে ঘিরে দাঁড়াল চন্দ্রাপীড়কে। পাছে বিরহীরা তাদের ছিঁড়ে নিয়ে শয্যা রচনা করে সেই ভয়ে মুদ্রিত হল পদ্মের সংহতি, আর

সঙ্গিনীহীন উদাস চক্রবাক উড়তে লাগল আকাশে;—করুণকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করে যেন ফিরে ফিরে বললে, 'ফিরে যাও, কাদম্বরীর কাছে ফিরে যাও'।

অবচেতনার মধ্য দিয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যেতে লাগল।

প্রৌঢ় হল প্রদোষ।

দেখতে দেখতে চাঁদ উঠল আকাশে—

অমৃতের যেন রজত কলস,

পূর্ব্বদিগ্বধূর ললাটে চন্দনের একটি হলুদবরণ টিপ।

চাঁদের সুধালিপ্ত করের স্পর্শ পেল চন্দ্রাপীড়ের তপ্ত সুকুমার ললাট, জ্যোৎস্নাজলে হল আর্দ্র।

বল্লভোদ্যানে চন্দ্রমণিশিলার উপর অঙ্গখানিকে এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল চন্দ্রাপীড়—কেয়ুরক হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ে। সহসা চন্দ্রাপীড় প্রশ্ন করল—

"কেয়ুরক, তুমি আমাকে কি কিছু বলছিলে?"

প্রশ্নের বাণীহীন উত্তর দিয়ে গেল কেয়ুরকের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু আভাস।

প্রকৃতিস্থ হয়ে শেষে চন্দ্রাপীড় বললে—

"যতক্ষণ না আমরা পৌঁছই ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি বেঁচে থাকবে আমাদের কাদম্বরী? আশ্বাস দিতে পারবে কি তাঁকে—মদলেখা? ফিরবেন কি আর্য্যা মহাশ্বেতা? আমার যা পরিচয় পেয়ে গেছেন তাতে মদলেখা বা মহাশ্বেতার কথা তিনি ত কানে নাও নিতে পারেন। বোধ হয় এ জন্মের মত শেষ হয়ে গেল আমার

দেখা—তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির একটি মৃদু ঢেউ—শিশুহরিণের চোখের মত তাঁর ডাগর চোখে উৎত্রাস।"

কেয়ূরক তখন নিবেদন করে বললে—

"দেব, অধীর হবেন না—কি করে শীঘ্র যাওয়া যেতে পারে তারি চিন্তা করুন। আমি দেখে এসেছি;—দেবীর কাছে কাছেই ফিরছে তাঁর নিপুণ সখীরা, তাঁর পরিজন। আমি বলছি—আপনাকে দেখবার বাসনাই দেবীর সাহসকে শৃঙ্খলিত করে রাখবে; মিলনের আশা হৃদয়কে বিদীর্ণ হতে দেবেনা; কেবল বহাবে দীর্ঘশ্বাস, সারাক্ষণ শরীরকে করবে রোমাঞ্চিত, নয়নে জাগাবে অশ্রু, নিদ্রাহীন করবে রজনী।"

কেয়ূরকের কথায় বাধা দিয়ে চন্দ্রাপীড় আদেশ দিল—'বিশ্রাম কর'। কিন্তু বিশ্রাম নিল না নিজের মন। কী করে যে যাওয়া যেতে পারে—এই চিন্তাই রইল প্রবল হয়ে।

যদি পিতামাতাকে না জানিয়ে, তাঁহাদের প্রণাম না করে, আশীর্ব্বাদ শিরশ্চুম্বনের প্রসাদ না পেয়ে, হঠাৎ স্বেচ্ছাচারীর মত চলে যাই—তাহলে কি সুখী হব, না শান্তি পাব হৃদয়ে? অকল্যাণের অঙ্কুরে কি শুভ ফলের আশা থাকে?"

তখনি আবার চন্দ্রাপীড়ের মনে হল—"কাজ কি এত ভবিষ্যতের ভাবনায়?

যদি পিতামাতাকে না জানিয়েই চলে যাই তাহলেই বা নিস্তার কোথায়? মুহূর্ত্ত পরেই সন্ধান চলবে, দিকে দিকে বেরিয়ে পড়বে শতসহস্র রথতুরগ, ক্ষুভিত হয়ে উঠবে মেদিনী, লক্ষ লক্ষ পতাকায় অন্তর্হিত হবে সূর্য্যের আলো, আটটি দিক্ তোলপাড় করে ফেলবে সামন্তরাজারা আর যবন দেশের অশ্বপদাতিক।

রাজাদের কথা যদি নাই ধরি,—তাহলেও রাজভক্ত প্রজারা না খেয়ে না দেয়ে, ঘরসংসার ফেলে রেখে আমার খোঁজে লাগবে।

আমি ছাড়া আমার পিতারও ত আর কেউ নেই, যে আমার উপর রুষ্ট হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত স্নেহ অন্য কারোর উপরে ঢেলে দেবেন—ভাববেন—গেছে গেছে, না আসে ত আর কি করা যাবে।

মায়েরই বা আমার কি হবে? আমার মুখ দেখলে তবে সুখে কাটে তাঁর দিন।

আর যদি একবার আমার পিছনে ধাওয়া করেন মহারাজ নিজে, তাহলে বুঝতে হবে এই অষ্টাদশ-দ্বীপমালিনী বসুন্ধরা আমার পিছু নিয়েছে।

তখন আমি মুখ দেখাব কি করে? কি উত্তর দেব?

যে মা দুঃখের বাতাস পাননি জীবনে, তাঁকে কষ্ট দিলে নিষ্পুণা হয়ে জন্ম জন্ম কষ্ট পেতে হবে ত আমাকেও।

তার চেয়ে অনুমতি নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।—

কিন্তু কি বলব তাঁদের?

কোন লজ্জায় বলি—যে গন্ধর্ব্বরাজপুত্রী কাদম্বরী আমার জন্য দুঃখ পাচ্ছেন; পঞ্চশর ফুলের আঘাত দিয়ে তাঁর অঙ্গটিকে খিন্ন করে দিয়েছেন;—আমিও ভালবেসেছি; তাঁকে না দেখে জীবনে একটুকুও আনন্দ আমার নেই।

যদি বলি আর্য্যা মহাশ্বেতা আমাদের দুজনের বিবাহ স্থির করে দিয়েছেন!

যদি বলি চোখ দিয়ে দেবীর কষ্ট না দেখতে পেরে আমাকে নিতে এসেছে কেয়ূরক!

তাই বা কেমন করে বলব? তিন বৎসর পরে ফিরেছি।

এখন অত কথা কি সাজে? কোন মুখে বলি।

বৈশম্পায়ন থাকলে ভাল হত। এখনও ফিরলনা সে স্কন্ধাবার নিয়ে। কাকে জিজ্ঞাসা করি, কার কথা শুনি।

সমদুঃখী ত কাউকে দেখি না।

কাকেই বা জানাই গোপন কথা? কার হাতেই বা বলার ভার দিয়ে বসে থাকি তিক্ত প্রতীক্ষায়; আমার হয়ে কেইবা এত কষ্ট ওঠায়?

রুষ্ট পিতৃদেবকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কেইবা শেষে আমাদের মিলন ঘটায়?"

এই সব চিন্তার ভিতর দিয়ে দুঃখদীর্ঘ হলেও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল রাত্রি।

প্রাতঃকালেই জনশ্রুতি শোনা গেল—"দশপুর পর্য্যন্ত স্কন্ধাবার এসেছে।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়।

ধন্য আমি, ধন্য আমার ভাগ্য, অনুধ্যান-মাত্রই বৈশম্পায়ন এসে উপস্থিত হয়েছে।

প্রণাম করতে করতে যখন দেখা দিল কেয়ূরক তখন দূর থেকেই হর্ষস্ফীত নয়নে গর্জ্জে উঠল চন্দ্রাপীড়—"কেয়ূরক, সিদ্ধি আমার মুঠোর মধ্যে। এসেছে, বৈশম্পায়ন এসেছে।"

"কুমার, দেহে আমার প্রাণ এল—শান্ত হল জগৎ"—

এই কথা বলতে বলতে চন্দ্রাপীড়ের পার্শ্বে উপবেশন করে ইঙ্গিতে সমস্ত পরিজনদের উৎসারিত করে দিয়ে হাস্যচটুল কাব্যোপম বাক্যে রস বিকীর্ণ করতে করতে বলতে লাগল কেয়ূরক—

"স্ফুর্য্যমান বিদ্যুৎবল্লী যেমন নিবেদন করে মেঘাগম,
উপারূঢ় শ্যামিকা মেঘলেখা যেমন—বর্ষা,
দর্শিতপাণ্ডুচ্ছবি প্রাচী যেমন—চন্দ্রোদয়,
পরিমলগ্রাহিণী মলয়-সমীরিকা যেমন বসন্তের আবির্ভাব,
তেমনি এই জনশ্রুতি ঘোষণা করছে আপনার নিঃসংশয়িত যাত্রা।
ঘটবেই, দেবীর সঙ্গে আপনার মিলন।
কেউ কি কখনো দেখেছে
চাঁদ রয়েছে—জ্যোৎস্না নেই?
ফুটে রয়েছে পদ্মফুল—মৃণালিকাহীন?
আম্রমঞ্জরী-অনাথ বসন্ত?"

তারপরে হঠাৎ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠল কেয়ূরক

"কিন্তু কুমার, যতক্ষণ না বৈশম্পায়ন এসে পৌঁছন, যাত্রা সম্বন্ধে যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ হয় আপনার আলাপ, ততক্ষণত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। দেবীর শরীর যেমন দেখে এসেছি তাতে আমার পক্ষে এখানে আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার অবগত

হয়ে তাঁর মনেও হতে পারে—যে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন রয়েছে, দুঃখ সহ্য করেও তাঁকে বেঁচে থাকতেই হবে।
সেই জন্যেই এ কথা আপনাকে জানাচ্ছি।
চিত্তযোগে আপনি ত সেখানে আগেই পৌঁছে গেছেন, শরীরযোগে আপনি ত চলেইছেন—আমি আর এখানে থাকি কেন ?
এখন আমাকে অনুমতি করুন—প্রণয়প্রসাদনির্ভীক কেয়ূরক নিবেদন করবে আপনার আগমন-মহোৎসব।"

চন্দ্রাপীড়ের অন্তরের আনন্দ পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার দৃষ্টিতে, যেন হঠাৎ ফুটে উঠল একগাছি নীলপদ্মের মালা। ক্ষণিক চিন্তার পর চন্দ্রাপীড় কেয়ূরককে বলল—

"তোমাকে আর কি বলব। যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি যে আসছি তার ন্যাসস্বরূপ পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। হয়ত দেবী তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। পত্রলেখাও দেবীর প্রিয়।"

এই কথা বলে পত্রলেখার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল চন্দ্রাপীড়।
অবনতমুখী পত্রলেখা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল আদেশের। মেঘনাদকে আহ্বান করে চন্দ্রাপীড় তখন বলল—

"মেঘনাদ, যেখান থেকে এই সেদিন পত্রলেখাকে নিয়ে এসেছিলে সেইখানে কেয়ূরককে সঙ্গে নিয়ে পত্রলেখাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস। বৈশম্পায়নের সঙ্গে দেখা করেই ইন্দ্রায়ুধে আসছি।"

"কুমার যা আদেশ করেন" এই কথা বলে প্রণামান্তর মেঘনাদ ত্বরিত-যাত্রার আয়োজন উপলক্ষে প্রস্থান করল।
প্রণত কেয়ূরককে আলিঙ্গন করে নিজের কান থেকে অনেকবর্ণরুচির সন্দেশের মত কর্ণাভরণ খুলে নিয়ে তার কানে দুলিয়ে দিয়ে পূর্ণকণ্ঠে বলে উঠল চন্দ্রাপীড়

"কেয়ূরক, দেবীর কাছ থেকে তুমি ত কোন খবরই নিয়ে আসনি। সেইজন্য তোমার মুখে দেবীর কাছে কোন খবর পাঠান অসম্ভব। অথচ দেবী

যদি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করেন তাহলে তোমাকে লজ্জিত হয়ে দুঃখ পেতে হবে। পত্রলেখা যাচ্ছে—যা বলবার সেই বলবে।”

অতর্কিত বিরহপীড়ায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল পত্রলেখা;—পাছে অমঙ্গল হয় এই ভয়ে অনেক যত্নসত্ত্বেও মানছিলনা তার চোখের জল। পত্রলেখাকে নিকটে টেনে নিয়ে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে চন্দ্রাপীড় মিনতিভরে বললে—

পত্রলেখা—ললাটে অঞ্জলি রচনা করে দেবী কাদম্বরীকে জানিও—

“যে লোকের নাম সমস্ত শঠেদের নামাগ্রে লিখে রাখা উচিৎ, অযাচিত প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও যে চপল দেবীর বাসনাকে রেখেছে অপূর্ণ—হায় দেবি, তার গুণের সঞ্চয় দোষের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার প্রজ্ঞা আজ জড়তায় আচ্ছন্ন,
চঞ্চল তার ধৈর্য্য, লঘু তার গরিমা,
কৃতজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে কৃতঘ্নতায়।

কোন্ গুণকে অবলম্বন বরে সে আজ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে পুনর্ব্বার বলবে—‘আমাকে স্থান দাও’। কী গুণ দেখেই বা দেবী তাকে দান করবেন বরাভয়!

অলীক আত্মদানের ছলনা করে সে কি প্রতারিত করেনি দেবীকে? সে কি তস্করের মত অন্ধকারে মিলিয়ে যায়নি কোমলতম হৃদয়কে কঠিনতম আঘাত করে?

সেই ত উপেক্ষা করেছে দেবীর শরীরের অবস্থা,
সমস্ত দুর্দ্দৈবের সেই ত একমাত্র কারণ!

আর আজ দেবি, গুণহীনের একমাত্র আশ্রয় আপনার গুণ।—একমাত্র তার সম্বল।

প্রেমের হোমানলে যে পুড়ছে তাকে আজ বাঁচিয়ে রেখেছে আপনারই স্বভাবসরস সরলতা; আপনারই স্নেহ বারম্বার তাকে আহ্বান করে; আপনারই স্থির-প্রতিজ্ঞতা অকৃপণ দাক্ষিণ্য তাকে বরণ করে নিয়ে আসে আপনার কাছে।

চরণের তলায় যে লোক বিলীন হয়ে রয়েছে তাকে ভৎর্সনা করেনা মৃদু আপনার হৃদয়, হৃদয়ের উদারতা তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে মধুর আলাপে হৃদয়ে দেয় স্থান।

আমার মত নির্লজ্জ যে দেবীর কাছে মুখ দেখাবার সাহস রাখে—সেও দেবীর শুভ্র উদার প্রসাদের কৃপায়। ক্ষণপরিচিত সেই প্রসাদ জীবনের প্রত্যাশা জাগিয়ে আমাকে দিয়ে কী না করিয়ে নিচ্ছে?—

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেবা,
পাঠ দিচ্ছে সেবা-চাতুর্য্যের,
উপদেশ দিচ্ছে আরাধনার উপায়,
বলছে—'অমন হলে চল্‌বেনা,এই রকম করে
সেবা কর,'
মিনতি করে বলছে—'মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ
—অভিমান কোরোনা,'
লজ্জায় যে ফিরে যাচ্ছিল তাকে জোর করে সামনে
এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে,বলছে—'যখন তোমার উপর
সন্তুষ্ট হবে তখন তাকে আরও খুসী কোরো
তার গুণের বর্ণিমা করে,'
রইতে দিচ্ছে না অন্য কোথাও একটি মুহূর্ত্তও।

সে প্রসাদকে কি আমার মত কাঙাল ছেড়ে দিতে পারে?
তাঁর কাছে যাবার আদেশ আমি পাই নি;
এই প্রসাদগুলিই তাঁর পদমূলে আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে।"

কাদম্বরীকে এই কথাগুলি বলতে বলে চন্দ্রাপীড় ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল—তারপর যাতে চন্দ্রাপীড়ের হেমকূটে আসা বিফল না হয়, শূন্য না হয় জগৎ সেই উদ্দেশ্যে পত্রলেখাকে সম্বোধন করে আবার বলল—

"পত্রলেখা, তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ—তাই বলে যেতে যেতে

পথে যেন কাতর হয়ে পড়না। শরীর-সংস্কারে যেন অনাদর না ঘটে, সময়মত আহার কোরো ; না বিবেচনা করে কারও কথায় কান দিও না। ভুল পথে গিয়ে বা অলস হয়ে পথে পথেই বইয়ে দিও না বেলা। কি করব বল ?

ভালবেসেছি।

মনে রেখো,—কাদম্বরীর প্রাণ, আর আমার প্রাণ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একলা চলেছ।"

এই বলে পত্রলেখাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করে কেয়ূরককে বিদায় দিল চন্দ্রাপীড় ; বিদায়বেলায় কেয়ূরকের উপর আদেশ হল—"আমাকে নেবার জন্য পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে আর্য্যা মহাশ্বেতার আশ্রমে এসে অপেক্ষা কোরো।"

বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের মনে জাগল অনেক রকমের চিন্তা—

'যেতে এদের দেরী হবে না ত ?
যদি সময়ে না পৌঁছয় !
কবেই বা গিয়ে পৌঁছবে তার ঠিক্ কি।'

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপীড়ের হৃদয়ে এল বৈশম্পায়নকে দেখবার প্রবল আগ্রহ। বার্ত্তাহরের উপর আদেশ হল "স্কন্ধাবারের সঠিক খবর নিয়ে এস।"

তারপরে নিজে চলল—সম্রাট্ তারাপীড়ের সভায় ; অনেকদিনের অদেখা বৈশম্পায়নকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসব—তারি অনুমতি-লাভের অভিপ্রায়ে।

সম্রাট্ তারাপীড়ের সভায় উপনীত হল চন্দ্রাপীড়।

সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল প্রতিহারমণ্ডলী।

দক্ষিণ জানু ও করতল দিয়ে মণিকুট্টিম স্পর্শ করে—মণিকুট্টিমের স্বচ্ছতায় কুন্তলকলাপের দ্বিগুণায়মান প্রতিবিম্ব ফলিয়ে চন্দ্রাপীড় প্রণাম করল সম্রাট্‌কে।

দূর থেকে কুমারকে প্রণাম করতে দেখে সম্রাট্ তারাপীড় সলিলমন্থর জলধর-ধ্বনিতের মত নির্ভরস্নেহগম্ভীর কণ্ঠে "এস এস" বলে চন্দ্রাপীড়কে আহ্বান করলেন্।

অমাত্য শুকনাসকে প্রণাম করে চন্দ্রাপীড় যেই উপবেশন করবে ভূতলে অমনি তারাপীড় তার হস্তাবলম্বন করে নিজের পাদপীঠে নিলেন বসিয়ে।

তারপর চন্দ্রাপীড়ের গণ্ডদেশে কন্দর্পদীপকের কজ্জল শিখার মত শ্মশ্রুরাজির নব আবির্ভাব দেখে স্মিতমুখে বললেন—

"শুকনাস, দেখেছ, চন্দ্রাপীড়ের কপোলদুটিতে—স্বর্ণমেরুর শ্যাম প্রভার মত শ্মশ্রুর নবরেখা? যেন পাপড়িগুলিকে মেলে দেবার অপেক্ষায় পদ্মের উপর বসে রয়েছে ভ্রমরের একটি পংক্তি; যেন রূপের আলেখ্যটিকে ফুটিয়ে দিতে চায় কৃষ্ণাঞ্জনের তুলিকা। আর ত দেরী করা চলে না। এবার বিবাহ দিতে হবে। দেবী বিলাসবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি রাজকন্যা দেখ। দুর্লভদর্শন পুত্রের মুখত দেখলুম এবার পদ্মের মত বধূর মুখখানি দেখে হৃদয় জুড়োই।"

শুকনাস ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—

"এবিষয়ে মহারাজের সঙ্গে আমি একমত। কোন বাধা ত দেখিনে। কিছুই ত আর কুমারের বাকি নেই। বিদ্যা বশে এসেছে; নিখিল কলায় দক্ষ আমাদের কুমার; প্রজালোক পদানত। কি কাজ আর বাকি রইল? সমুদ্রমেখলা পৃথিবী যাঁর স্কন্ধলগ্না, রাজলক্ষ্মী যাঁর অচঞ্চল কুটুম্বিনী—তাঁর সত্যই অবশিষ্টের মধ্যে রয়েছে একমাত্র উদ্বাহ-মঙ্গল।"

এই কথা বলে নয়নের কোণে একটু হাসি জাগিয়ে চন্দ্রাপীড়ের দিকে শুকনাস চাইলেন।

লজ্জায় নত হয়ে এল চন্দ্রাপীড়ের মুখ।

লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে এল অপ্রত্যাশিত আনন্দ।

কেমন করে উপস্থিত হল পিতার এই বুদ্ধি!

এ যে অন্ধকারে আলোক দেখা!

বনের মধ্যে যে পথ হারিয়েছে সে যেন হঠাৎ পৌঁছে গেল দেশে!

মুমূর্ষুর উপর যেন অমৃতের বৃষ্টি!

একবার বৈশম্পায়ন এলে হয়!

মিলন হবেই আমার কাদম্বরীর সঙ্গে।

চন্দ্রাপীড়ের চিন্তাকে অসমাপ্ত রেখেই গাত্রোত্থান করলেন সম্রাট্ তারাপীড়। পুত্রের বিনয়াবনত অংসদেশে হস্তস্থাপন করে শুকনাসকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে এলেন দেবী বিলাসবতীর মন্দিরে।
চন্দ্রোদয়ে বিলোল সমুদ্রবেলার মত হল বিলাসবতীর অবস্থা। ওষ্ঠাধরে হাস্য ও কপট-ভৎ'সনার মিলন ঘটিয়ে তারাপীড় বললেন—

"দেবি, তোমার কি হয়েছে বলত? ছেলের মুখে জেগেছে যৌবনের সূত্রপাতরেখা—শ্মশ্রুরাজির শোভা, তার তোমার মনে জাগলনা বধূমুখ দেখবার স্পৃহা? কথার ত উত্তরই দিচ্ছ না। লজ্জায় এখনও ফিরিয়ে রয়েছ মুখ। তুমি দেখছি বড়মা হলে! ভাল নয়ত, পুত্রের বিবাহে এত অনাদর! তুমি কি ভালবাসনা চন্দ্রাপীড়কে?"
নর্ম্মপ্রায় আলাপের ভিতর দিয়ে ক্ষণিক বিশ্রামের পর সুখায়মান চিত্ত নিয়ে প্রস্থান করলেন তারাপীড়। স্নানের সময় আসন্ন।

ইতিমধ্যে শুকনাসকে দিয়ে বলিয়ে চন্দ্রাপীড় পিতার কাছ থেকে বৈশম্পায়নকে অভ্যর্থনার অনুমতি গ্রহণ করেছিল।
আগামী প্রত্যূষের প্রতীক্ষায় জননীভবনেই সে রয়ে গেল।
সারাটি দিন কোনো রকমে তার কাটল—কিন্তু গৈরিকবরণ সায়াহ্নের আলস্য পীড়িত করতে লাগল চন্দ্রাপীড়কে।
তারপরে এল চন্দ্রকরোজ্জ্বল যামিনী।

পালঙ্কে শয়ন করেও ঔৎসুক্যের আধিক্যে মুদ্রিত হলনা চন্দ্রাপীড়ের আঁখিপর্ণ।
দিক্প্লাবিনী জোৎস্নায় নয়ন মেলে সে শুয়ে শুয়ে মায়া দেখতে লাগল।

অম্বরতলের নীলিমা ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নার রঙে রূপান্তরিত হয়ে গেল,
কে যেন অলক্ষ্যহস্তে তরুগহনের শ্যামলিমা নিল হরণ করে,

লতা-পাতার, শাখা-প্রশাখার রন্ধ্রমুখে পথ করে নিয়ে তরুতলের গাঢ় ছায়াকে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে চন্দ্রদেব চুম্বন করলেন ধরণীকে।

ক্রমে বিদায় নিয়ে গেল এক প্রহর রাত্রি। নিদ্রাহীন চন্দ্রাপীড়ের নয়ন।
চন্দ্রের কিরণের ভিতর কি রয়েছে জানিনে—কিন্তু মনে হয় যেন অন্তর ও বাহির উন্মাদ হতে চলেছে।
চন্দ্রাপীড় দেখতে পেল—

দিগ্বধূদের মুখগুলিকে কে যেন কর্পূরের রেণু দিয়ে উদ্ধূলিত করে দিচ্ছে,
সান্দ্রচন্দনের পঙ্কে কে যেন লেপন করে দিচ্ছে যামিনীর অঙ্গ,
আকাশের সঙ্গে মৈত্রী ঘটিয়ে কে যেন বুকে তুলে নিচ্ছে মেদিনীকে।

ক্রমে চন্দ্রাপীড়কে অভিভূত করতে লাগল চন্দ্রের মোহ, প্রতিক্ষণের নবতা:

সংক্ষিপ্ত হতে লাগল গ্রহতারকার দল,
ক্রীড়া-নদীতে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিল রূপালি জলের ধারা,
রাজপথে, চত্বরে, প্রাসাদের শিখরে পর্য্যস্ত হয়ে পড়ল স্নিগ্ধ শুভ্রতা।

প্রস্ফুটিত কুমুদবনের অস্তিত্ব হারাল,—কে যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেছে একটি প্রকাণ্ড কুমুদ,

ভেদ রইল না মরালে আর জোৎস্নায়,
উচ্ছল জল-তরঙ্গে চমক জাগিয়ে নেচে উঠল জ্যোৎস্না।

এম্নি করে অবসন্ন হল দ্বিতীয় প্রহর।
চন্দ্রাপীড়ের উন্মাদিত চিত্তকে আরও উন্মত্ত করে দিল

প্রাসাদের চন্দ্রাশ্রয়ে সুপ্তকামিনীদের কপোলে খণ্ড খণ্ড লাবণ্যের মুক্তার মত ঢলঢল জ্যোৎস্না।

মন্মথের সব কটি বাণ যেন রূপ গ্রহণ করে ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে।
শয্যায় শয়ন করা অসম্ভব হয়ে উঠল।
থাকতে না পেরে শেষে চন্দ্রাপীড় আদেশ দিল

"প্রস্থানশঙ্খ ধ্মাত করা হোক্!"

উঠল শঙ্খধ্বনি—

নগরীর মেঘচুম্বী প্রাকারে আবর্তিত হয়ে, দিকুঞ্জে প্রতিহত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গগনের বিপুলতায়। সেই শঙ্খধ্বনি আরোহণ করল উত্তুঙ্গ গোপুরাট্টালকের শিখরে, চলে বেড়াতে লাগল সৌধের অন্তরে; চতুষ্কচত্বরে বিকশিত হয়ে প্রাসাদ-কুক্ষিতে মূর্চ্ছিত হয়ে, প্রতিধ্বনিত হল ক্রীড়াশৈলের গহ্বরে।

চীৎকার করে জেগে উঠল গৃহসরোজিনীতে সারসের দল, স্বভাবগদ্গদ্ ভবনহংসদের সে কি মুহুর্মুহু কলরব! ঝঙ্কার দিয়ে জেগে উঠল শতশত করচরণের চলবলয় আর নূপুর।

দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল মন্দুরা থেকে শতসহস্র অশ্ব। চিকিয়ে উঠল সাজের সোনার আভা,

চক্কর দিতে দিতে তারা বেরিয়ে আসতে লাগল প্রাঙ্গণটিকে পরিপূর্ণ করে—সঙ্কীর্ণ করে দিয়ে নগরীর বিস্তার।

আকাশ আচ্ছন্ন হল ভল্লকে,

মেদিনী পূর্ণ হল ক্ষুররবে আর হ্রেষায়,

যুবরাজের প্রাঙ্গণে ফুলের তোড়ার মত ফুটে উঠল ফেনকের পুঞ্জ,

চমকে উঠতে লাগল জ্যোৎস্না—রত্নের বর্ণচ্ছটায়।

অশ্বারোহী রাজপুত্রদের প্রণাম গ্রহণ করতে করতে ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ করে অঙ্গন থেকে বেরিয়ে পড়ল চন্দ্রাপীড়।

সামনে তার হংসবরণ মঙ্গলাতপত্র—যেন আলো দেখিয়ে আগে আগে চলেছে আর একটি পূর্ণচাঁদ।

নাগরিক-শূন্য রাজপথ। ধীরে ধীরে নগরী থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রাপীড়ের বিপুল অশ্ববাহিনী।

সম্মুখের দীর্ঘপথে জ্যোৎস্নাপ্রবাহের নির্ভরতা; জ্যোৎস্নার শুভ্র প্রাচুর্যে শিপ্রার জলতলটিকে রজতমার্গ বলে ভ্রম হতে লাগল; ভুল ভাঙাল কেবল কূজনমুখর রাজহংসের লীলা, ভুল ভাঙাল কেবল তরঙ্গসিক্ত সমীরণের স্নিগ্ধ স্পর্শ।

শিপ্রানদী উত্তীর্ণ হয়ে অশ্ববাহিনী দশপুরের পথে ছুটে চলল বেগে।

যখন নিশাবসান হল তখন দেখা গেল বাহিনী তিনযোজন পথ অতিক্রম করে ছুটেছে।

পথশ্রান্ত বাহিনীর শ্রম লাঘব করে ধীরে ধীরে বইতে লাগল রজনীবিরামপিশুন হিমভার-মন্থর মাতরিশ্বা—

জ্যোৎস্নাস্নানে অঙ্গ যার শীতল,
বিনিদ্র কুমুদিনীর সঙ্গসুখে অঙ্গলগ্ন যার পরিমল।

ক্রমে শর্ব্বরীর বিরহ-চিন্তায়, দিনমণির আসন্ন অভ্যুদয়ের ঈর্ষ্যায়, অশ্বখুরধূলির উপঘাতে ও সংঘাতে ম্লান হয়ে এল চন্দ্রবিম্ব;

অঙ্গ থেকে উত্তরীয়ের মত খসে পড়ে গেল চন্দ্রলাবণ্য জ্যোৎস্না;

ফেনবুদ্বুদের মত আকাশসমুদ্রে বিলীন হল নক্ষত্রের দল;

দলিত মুক্তার মত গৌর হয়ে উঠল দিগ্বধূদের মুখ;

মরকত-কান্তিতে স্ফুট হল তরুলতিকা—যেন তারা মাথা তুলল জলের তলদেশ থেকে।

প্রভাত হল।

পূর্ব্বাশার কর্ণমূলে রক্তাশোকপর্ণের সন্দেহ জাগিয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রভাতের অরুণ লালিতা; সেই অরুণিমাকে দেখে মনে হল যেন এই সবেমাত্র দেখা দিয়েছে সূর্য্যরথের রক্তধ্বজা;

রক্ত রৌদ্রের আভা ঢলে পড়ল তরুর শিখরে।

দাবানল ভেবে ডেকে ডেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে লাগল পাখী, উষর শয্যায় হাত পা ছুঁড়ে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে বসল হরিণের দল,
গ্রামান্তের গোচারণে দেখা মিলল গোধনের ;
তারপর হল সূর্য্যের প্রকাশ—সপ্তলোকের যিনি নয়নমণি, যাঁর রথ টেনে ছুটে চলেছে সাতটি জ্যোতির তুরঙ্গ। নীল তিরস্করিণীর মত তিমিরলেখাটিকে সরিয়ে দিয়ে সূর্য্য উঠলেন উদয়গিরির শিখরে।

. . .

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের চোখে পড়ল—প্রায় অর্দ্ধগব্যূতি দূরে—বৈশম্পায়নের বিরাট স্কন্ধাবার।
পরিচিত হলেও প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে স্কন্ধাবারটিকে অভিনব বলে মনে হতে লাগল। যেন এক প্রাণিময় কূলহীন মহাসমুদ্রের অষ্টম অজলগম্ভীর কল্পনা, যেন চলন্ত মেদিনীর দ্বিতীয় সন্নিবেশ। তরঙ্গের মত উঠছে পড়ছে পিণ্ডীভূত হস্তী-অশ্বের সমারোহ। তাদের মধ্যে উড্ডীয়মান পতাকাগুলিকে দেখে চন্দ্রাপীড়ের মনে হল, যেন চলে আসছে বর্ষার একখানি কৃষ্ণমেঘমেদুর দিন—অবিরল বলাকাবলীতে বিভ্রাজিত।
চন্দ্রাপীড়ের আনন্দ বললে—"ভালই হয়েছে, এখন এক কাজ করা যাক্। বৈশম্পায়ন জানে না যে আমরা আসছি। হঠাৎ দেখা দিয়ে তাকে চমকে দিতে হবে।"
চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হল রাজপুত্রদের গতি ; বর্জ্জিত হল ছত্র চামর ইত্যাদি রাজচিহ্ন।
দুই তিনটি বেগবান অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে, উত্তরীয়প্রান্তে মস্তক আবৃত করে, স্কন্ধাবারে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়।
প্রবেশ করেই
জনৈক প্রহরীকে প্রশ্ন করল—
"দেব বৈশম্পায়নের শিবির কোথায় ?
প্রহরীর নিকটেই কতকগুলি স্ত্রীলোক কী যেন কি কার্য্যে ছিল ব্যাপৃত। তারা প্রশ্ন শুনতে পেয়ে চন্দ্রাপীড়ের দিকে উদাস দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল

"ভদ্র, আপনি কী জিজ্ঞাসা করছেন? এখানে কোথায় দেব বৈশম্পায়ন ?"

কথাগুলি হঠাৎ যেন নিদারুণভাবে আঘাত করল চন্দ্রাপীড়কে। "আঃ পাপ! এরা কি প্রলাপ বক্‌ছে—পাগল!"

চিন্তাদেবীকে অবকাশ না দিয়েই শিবিরের দিকে ছুটে চলল চন্দ্রাপীড়। ছিন্ন হতে লাগল হৃদয়।

কোথায় চলেছি, কি দেখছি, কাকে ডাকছি ? চিন্তাবিরহিত হল মন।

ইন্দ্রায়ুধের পৃষ্ঠে, সৈন্যকটকের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল চন্দ্রাপীড়—অন্ধের মত, জড়ের মত, আবিষ্টের মত।

ইন্দ্রায়ুধকে দেখে সৈন্যবাহিনী বুঝতে পারল 'দেব চন্দ্রাপীড় এসেছেন'। মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়ে গেল 'কুমার এসেছেন'। রাজন্যেরা ছুটে বেরিয়ে এলেন—নিজের নিজের শিবির থেকে—উদ্বাষ্পশূন্য তাঁদের দৃষ্টি—অলক্ষিতে খসে পড়ছে উত্তরীয়।

লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রণামনত হল তাঁদের অঙ্গ তখন চন্দ্রাপীড় তাঁদের দিকে দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করল "কোথায় বৈশম্পায়ন ?"

সকলে বলে উঠলেন "আপনি আগে এই তরুতলে ইন্দ্রায়ুধ থেকে অবতরণ করুন। আমরা সবিশেষ আপনাকে জানাচ্ছি।"

•

স্পষ্ট কথা শুনলে যতটা কষ্ট হয় তার চেয়েও অধিক ব্যথা দিল বিজ্ঞপ্তির এই অস্পষ্টতা।

তবে কি, চন্দ্রাপীড়ের শঙ্কা—নির্লজ্জ সত্য ?

বিদীর্ণ হ'ত চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়—যদিনা, প্রণয়িণীর মত মূর্চ্ছা বক্ষে ধারণ করে রইত চন্দ্রাপীড়কে।

মহারাজ তারাপীড়ের সমবয়স্ক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজন্যেরা চন্দ্রাপীড়কে তখনি ধরে ফেললেন, ইন্দ্রায়ুধের পৃষ্ঠ থেকে সযত্নে নামিয়ে আস্তরণের উপর বসিয়ে দিয়ে শঙ্কিত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ফিরে এল চন্দ্রাপীড়ের জ্ঞান, ধীরে ধীরে।

জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল বৈশম্পায়নের চিন্তা।

সমস্ত যেন ভুল হয়ে গেছে;

একি তবে ইন্দ্রিয়ের মূর্চ্ছা? না, জগতের সমগ্রতা থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে যা কিছু দ্রষ্টব্য?

বৈশম্পায়ন স্কন্ধাবারে নেই—এই ব্যঞ্জনার অন্য কী অর্থ হতে পারে? রোগগ্রস্তের মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত। ইচ্ছা হল—কোথাও চলে যেতে, ছিন্ন করে দিতে জীবনের তন্ত্রী, সর্ব্বত্যাগী হয়ে ঘুরে বেড়াতে উদাসীনের মত।

মুহূর্ত্তে দ্রব হতে লাগল সমস্ত অন্তর. আবার মুহূর্ত্তে জ্বলে উঠতে লাগল হুতাশনের মত।

—দুঃখের সেকি বিদারণ-নৈপুণ্য!

এই কথা বার বার মনে হতে লাগল চন্দ্রাপীড়ের—

সৌন্দর্য্য চলে গেছে সুন্দরী ধরণীর,
নির্জন আজ পৃথিবীর জনতা,
কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে যত্নেরাখা পুণ্যফল,
কে যেন ব্যর্থ করে দিয়ে গেছে এ জন্মের সার্থকতা।

বৈশম্পায়ন ছাড়া আর কার সঙ্গে কথা কব? হৃদয়ের গোপন কথা আর কার কাছেই বা উজাড় করে বলব? কেই বা রইল আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী?

ক্ষণপরেই চন্দ্রাপীড়ের চিন্তার ধারা অবলম্বন করল অন্যপথ।

আমারই বা কি হবে? কাদম্বরীরই বা কি হবে?

কেমন করে মুখ দেখাব? আর্য্য শুকনাস যখন জিজ্ঞাসা করবেন তখন কী উত্তর দেব? শোকবিহ্বলা মনোরমা দেবী—তাঁকেই বা কি বলে দেব সান্ত্বনা?

আবার মনে হল—

তবে কি, কোন কাজ অসিদ্ধ রয়ে গেছে—যার জন্য সে পিছনে রয়ে গেল? না,

বিদ্রোহ করেছে কোন রাজা ? মন্ত্রতন্ত্র কিছু গ্রহণ করেনিত ? কই, লক্ষণ ত দেখিনি বৈরাগ্যের !

নতনয়নে চন্দ্রাপীড়ের চিন্তা আর থামেনা। কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নিজেকে ! কি যেন পাপ করে ফেলেছে !
তার পরে মুখ না তুলে গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল রাজন্যদের—

"আমি চলে আসার পর কি কোনো যুদ্ধ ঘটেছিল বা কোনো মহামারী—যাতে আমার উপর অকস্মাৎ বজ্রপাতের সম্ভব হল ?"

করপল্লবে আচ্ছাদিত হল রাজন্যদের কর্ণরন্ধ্র। তাঁরা নিবেদন করে বল্লেন—"কেন, অনিষ্ট চিন্তা করছেন। সাগ্রশতায়ু হোন্ আপনারা উভয়ে।"
নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল চন্দ্রাপীড়ের। উজ্জীবিত হয়ে কণ্ঠালিঙ্গনে রাজন্যদের আপ্যায়িত করে বলে উঠল—

"বেঁচে থেকে বৈশম্পায়ন যে আমাকে ছেড়ে থাকবে তা আমি ভাবতেও পারিনা। আমাকে বলুন, কোথায় সে, কেন সে এলনা ? কি হল তার ? একলা তাকে ফেলে রেখে আসা আপনাদের পক্ষে অন্যায় হয়েছে। আপনারাই বা কেন চলে এলেন ? জোর করে ধরে নিয়ে এলেই ত পারতেন ?"

নিবেদিত হল—

"দেব, যা ঘটেছে নিঃসঙ্কোচে আপনার কাছে বলব। এ ঘটনা নিবেদন করা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন।
দেব বৈশম্পায়নের হস্তে স্কন্ধাবারের রক্ষাভার অর্পণ করে যেদিন আপনি চলে আসেন খাদ্যাদির প্রাচুর্য্যহেতু তিনি আদেশ দেন—'স্থগিত থাক্ অদ্যকার যাত্রা।'
পরদিন প্রাতঃকালে যখন প্রয়াণশঙ্খ ধ্বনিত হয়ে উঠল, যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে যাত্রার সমস্ত আয়োজন, তখন তিনি আমাদের নিকটে এসে বললেন

"শুনলুম এখানে এক পবিত্র সরোবর রয়েছে—অচ্ছোদ তার নাম। আপনারা যদি কিছু না মনে করেন তাহ'লে সরোবরে স্নান করে, তীরভাগী

সিদ্ধায়তনে ভবানীপ্রভু শশাঙ্কমৌলিকে প্রণাম করে আসি। দেবতাদের এটি লীলা-ভূমি, স্বপ্নেরও অতীত এই স্থান।"

এই কথা বলে পদব্রজেই তিনি চলে গেলেন অচ্ছোদের তীরে।

অচ্ছোদের তীরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ফেলে আনন্দ আর ধরেনা। অপূর্ব্বসুন্দর সেই স্থান, সেখানে যেন খেলে বেড়াচ্ছিল আনন্দ। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে হরিৎমণির মত প্রভাবর্ষী একটি লতামণ্ডপ—শ্যামল করে রেখেছে দিগন্ত।

দিনের বেলাতেও সেখানে পত্রান্তরাল ভেদ করে প্রবেশ করতে পায় না সূর্য্য; নিশীথিনী যেন জড়িয়ে আছে মণ্ডপের অন্তরটিকে।

অভ্যন্তরের তরঙ্গশীতল আঁধারটিকে নবীন মেঘোদয় ভেবে বনময়ূরেরা উদ্গ্রীব নয়নে দেখছে আর মুহুর্মুহু তুলছে মধুর কেকা।

লতামণ্ডপটি—

যেন সুরভিমাসের পায়ে-চলা-পথ,
মকরকেতুর যেন আশ্রয়,
রতিদেবীর উৎকণ্ঠাবিনোদনের স্থান।

মণ্ডপের মাঝখানটিতে শিলাতল,—অচ্ছোদের সলিলমিশ্র সমীরণে বীজিত।

তারপরে হঠাৎ আমাদের সকলের মনে হল—

দেব বৈশম্পায়নকে লতামণ্ডপটি যেন ডাকছে;—

অমরবধূদের শ্রোত্র-শিখরের প্রণয়ভিখারী কিশলয়গুলি বাতাসের আঘাতে ঘুরে ঘুরে যেন তাঁকে ডাকছে;—

মকরন্দলোভী ভ্রমরের পুঞ্জ লতার পুষ্পশয়ন থেকে গুণ গুণ করে গুঞ্জন তুলে বারম্বার তাঁকে ডাকছে।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

অনেকদিনের না-দেখা বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেলে যেমন হয় এই লতামণ্ডপটিকে দেখে দেব বৈশম্পায়নেরও হল তাই।

অনন্যদৃষ্টিতে তিনি লতামণ্ডপটিকে দেখতে লাগলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমগ্র অস্তিত্বে এক পরিবর্ত্তনের প্রলয় ঘটে যেতে লাগল।

বিস্মৃত হল নয়নের পলকপাত,
শিথিল হয়ে এল দেহ,
মূর্চ্ছায় যেন স্তম্ভিত
বিস্ময়ে যেন বিকল।

শেষে বসে পড়লেন মাটির উপর। কি যেন মনে পড়ে যেতে লাগল, কিসের যেন সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা, কিসের যেন অনুধ্যান!
নির্ব্বিকার হল মুখ; চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল জল; স্তব্ধ।

দিশাহারার মত মাটির উপর তাঁকে বসে থাকতে দেখে আমাদের মনে হল—"এ বুঝি বা হবে যৌবনের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা—প্রকৃতির রূপ দেখে ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে চিত্ত। এমন সৌন্দর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে পরিণতবুদ্ধি রসিকদেরও হৃদয় অপহৃত হয়ে যায়; যারা তরুণ তাদের না হওয়াই আশ্চর্য্য।"
কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে আমরা তাঁকে বল্লুম

"যা দেখবার তাত দেখাই হল। চলুন, এখন স্নানাদি সমাপন করে ফেরা যাক্। বেলা অনেক বেড়ে গেছে। প্রয়াণসাজে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে স্কন্ধাবার। আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।"

আমরা তাঁকে এই কথা বল্লুম বটে, কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন তেমনই জড়ের মত, বোবার মত সেইখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।
মনেই হলনা আমাদের কথা তাঁর কানে পৌঁচেছে, মনেই হলনা তিনি কখনও শিখেছিলেন কথা-বলবার ভাষা।
লতামণ্ডপের দিকে চেয়ে চিত্রার্পিতের মত বসে রইলেন; নয়নের নিশ্চল মৌন তারাটিকে আবিল, হীনজ্যোতিঃ করে কেবল টল্‌টল্ করতে লাগল অশ্রুর বিন্দু।
শেষে যখন রূঢ়ের মত আমরা তাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলুম, তখন দেব বৈশম্পায়ন—কণ্ঠে তাঁর নিষ্ঠুর নিশ্চয়তা, লতামণ্ডপে গ্রথিত তাঁর একাগ্র দৃষ্টি,—আমাদের বললেন

"অসম্ভব আমার এখান থেকে নড়া। আপনারা স্কন্ধাবার নিয়ে ফিরে যান। চন্দ্রাপীড়ের স্কন্ধাবার নিয়ে এখানে আর এক-মুহূর্ত্তও থাকা আপনাদের উচিত নয়।"

তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলুম। এ কী হল তাঁর! এ হেন বৈরাগ্যের কী যে কারণ হতে পারে তা বুঝতে পারলুম না।

অনুরোধের অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে শেষে ধৈর্য্য হারিয়ে নিষ্ঠুরবাক্যে তাঁকে বললুম

"আপনি কি বলছেন! মহারাজ তারাপীড়ের শ্রদ্ধাস্পদ শুকনাসের আপনি পুত্র, মহারাণী বিলাসবতীর ক্রোড়ে আপনি লালিত, দেব চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে একত্রে একই বিদ্যাগৃহে আপনি মানুষ;—তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত, আপনার সুহৃদ, আপনার প্রভু। স্কন্ধাবারের রক্ষাভার আপনার উপর সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত রয়েছেন—তাঁকে ত্যাগ করা কি আপনার শোভা পায়?

আমাদের স্নেহ বা ভক্তির কথা এখন থাক্। এই জনহীন অরণ্যে একলা আপনাকে ফেলে রেখে যাবই বা কেমন করে? দেব চন্দ্রাপীড়ের সামনে গিয়ে কি বলে মুখ দেখাব? আমরা ত দেব চন্দ্রাপীড় ও আপনাকে পৃথক করে দেখিনা। জীর্ণ বস্ত্রের মত অঙ্গ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন এই সম্মোহ। উঠুন, ঘুচিয়ে ফেলুন মনের অবসাদ, চলুন।"

বিফল হল পরুষ বাক্য।

দিশাহারা নয়নে মুখের দিক চেয়ে রইলেন।

ক্ষণপরে ওষ্ঠতটে হাসির একটি ক্ষীণরেখা এঁকে আমাদের বললেন—

"আপনারা কি মনে করছেন—এতটুকুও আমার জ্ঞান নেই? আমি কি ঘুমিয়ে রয়েছি—যে বারম্বার আমাকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন? চন্দ্রাপীড়কে ছেড়ে একমুহূর্ত্তও আমি থাকতে পারিনা;—এ যে কত বড় সত্য, আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবুও কি করব। এই মুহূর্ত্তে—গলে ঝরে শেষ হয়ে গেছে আমার উপর আমার প্রভুত্ব।

কি যেন মনে পড়ে গেছে—তাই মন লাগছে না অন্য কাজে,
কি যেন দেখেছে—তাই আর দেখতে পায়না আমার চোখ,
কাকে যেন জানতে পেরেছে—তাই আর কাউকে জানতে চায় না আমার হৃদয়,
লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে গেছে পা—চলবার উৎসাহ নেই চরণের।

এই জায়গায় কে যেন দেহটাকে গোঁজের মত পুঁতে রেখে দিয়েছে। ক্ষমতা নেই একপাও নড়বার। জোর করে আপনারা আমাকে নিয়ে যাবার চেস্টা করবেন না; আমি জানি এই স্থান থেকে ছিন্ন করে নিলে আমি বাঁচব না, আমি বাঁচতে পারিনা।

আমার সমস্ত অন্তর ঘিরে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে কী এক অজ্ঞাত রহস্যের অনুভূতি! মনে হচ্ছে, যে আমার দেহটাকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছে, হয়ত সেই আমার জীবনটাকেও এবার টেনে নেবে। মিছে আমাকে অনুরোধ করছেন। স্কন্ধাবার নিয়ে যাত্রা করুন। আপনারা সুখী;—যতদিন বাঁচবেন—দেখতে পাবেন চন্দ্রাপীড়ের মুখ। আমার পুণ্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে;—সে সুখে দৈব বোধ হয় অন্তরায়।"

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করল শঙ্কা।

অনেক তাঁকে বোঝালুম, বারবার বললুম—এ কি বলছেন আপনি! দেব চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে আপনার দেখা হবে না—এ কি সাংঘাতিক অকল্যাণের কথা!"

শেষে তিনি বললেন—

বলতে আমার লজ্জা হয়। সখা চন্দ্রাপীড়ের দিব্য দিয়ে আমি বলছি, আমি জানিনা;—কেন যে আমি এখান থেকে একপাও যেতে পারছিনা তার কারণ আমি জানিনা। আপনারা ত সব দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যান।"

এই বলে তিনি মৌন হলেন। বেড়ে চলল বেলা।
কিছুকাল পরে দাঁড়িয়ে উঠলেন ;
তরুর ছায়ায় ছায়ায়, লতার গহনে গহনে, সরোবরের তীরে তীরে, দেবায়তনের পথে পথে—ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ;
কি যেন কি খুঁজতে লাগলেন—বুঝি জন্মান্তরের কোন হারিয়ে-যাওয়া রত্ন।
ক্লান্ত হয়ে শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিরে এসে বসে পড়লেন সেই অপূর্ব্বসুন্দর লতামণ্ডপের তরঙ্গস্নিগ্ধ শিলায়। বাক্যহারা হয়ে আমরা মণ্ডপের সন্নিধানে দাঁড়িয়ে রইলুম—যদি জ্ঞান ফিরে আসে—এই আশায়।
এমনি করে কেটে গেল আর এক প্রহর বেলা।
স্নানাহার হয়নি এ কথা তাঁকে নিবেদন করাতে তিনি বললেন "বয়স্য চন্দ্রাপীড় তার নিজের প্রাণের চেয়েও আমার এই প্রাণটাকে বেশী ভালবাসে। এ প্রাণকে কি আমি সহজে ছেড়ে দেব ? স্নানাহার করতে হবে বৈকি। আমি চন্দ্রাপীড়ের মুখ দেখতে চাই—যমের নয়।"
তারপর স্নান সমাপন করে আহার করলেন—বনবাসীর মত কন্দমূল আর ফল।

তিনদিন তিনরাত এইরকম করে কেটে গেল—আমরা পারলুম না তাঁকে টলাতে। যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তাঁর আসা বা তাঁকে কোনরকমে নিয়ে-আসা তখন হতাশ হয়ে তাঁকে তাঁর সুকৃতি আর দৈবের উপর ফেলে রেখে চলে আসতে আমরা বাধ্য হয়েছি।
একবার ইচ্ছা হয়েছিল আপনাকে খবর দি। কিন্তু দেখা গেল—আপনি চারদিন আগে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হয়েছেন—দূত পাঠিয়ে আপনার কাছে খবর পৌঁছান অনেকদিনের সাপেক্ষ ; আর উজ্জয়িনীতে পৌঁছে তখনি আবার ফিরে আসার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কোন সার্থকতাই থাকবে না।"

বৈশম্পায়ন যে এমন ব্যবহার করবে স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেনি চন্দ্রাপীড়।
চিত্তকে অধিকার করে ফেলল নানান রকমের উদ্বেগ আর বিস্ময়।
এ রকম সর্ব্বত্যাগী বনবাসশরণ বৈরাগ্যের কি কারণ হতে পারে ?

আমি ত কোনো অপরাধ বা ত্রুটি করে ফেলিনি ?

কই, এমন ত কিছু মনে পড়ে না। সমান অধিকার, সমান সম্মান তাকে দিয়েছি, দিইয়েছি। তারও প্রসাদ পাবার লোভে দাঁড়িয়ে থাকে বহু রাজন্য। আমারি মত লোকে তাকেও ত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

পিতৃদেব, শুকনাস বা আর্য্যা মনোরমার স্নেহ থেকে, কই, সে ত বঞ্চিত নয়। তবে এ কেমন হল ?

আমিত ভাবতেই পারিনা—তিরস্কার করতে পারেন তাকে পিতৃদেব বা মন্ত্রী শুকনাস !

বহুমুখী তার প্রতিভা, ক্রূর নয়;—সে যে তরল, সে যে লঘু—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে এ অপবাদ তাকে দিতে পারে।

আজও বৈশম্পায়ন স্বীকার করেনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম;

পরিশোধ করেনি—দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ;

তার উপর এখনও নির্ভর করে রয়েছে বংশের প্রতিষ্ঠা;

সত্র, কূপ হর্ম্ম্য ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়ে পৃথিবীর সে· সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে—এই কল্পনা এখনও রয়েছে তার অপূর্ণ। ছড়িয়ে পড়েনি আকল্পস্থায়ি যশঃ।

তবে এ বৈরাগ্যের কি কারণ হতে পারে ?

সে কি কোনো রূপসীর মোহে পড়েছে—না কাউকে দেখেছে,—না, ব্যাখ্যা শুনেছে কোনো অপরূপসুন্দরীর রূপের গরিমার ?

রাজকন্যাদের মুখে এমন অপূর্ব্বদর্শনের কথা ত কিছু শোনা গেলনা।

ভোগের সমাপ্তিতে আসে বৈরাগ্য—ভোগ কাকে বলে বৈশম্পায়ন এখনও ত তা জানেনা।

পুরুষার্থসাধন যে ধর্ম্ম অর্থ কাম—এদের মধ্যে একটিও ত তার জানা নেই।

তবে তার এমন হল কেন ?

শূন্যহৃদয় নিয়ে তরুতল ত্যাগ করে, রাজকন্যাদের যথোচিত বিদায় দিয়ে চন্দ্রাপীড় চলল শিবিরের অভিমুখে।

শিবিরের উভয়পার্শ্বে—পল্লবমুখ হেমকলস,

উত্তুঙ্গ তোরণ-শৃঙ্গে চন্দনপল্লবের মাল্য।

পুষ্পাস্তৃত সিক্ত পথ দিয়ে আনতমস্তকে যখন চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করল শিবিরে তখন মণিচামর, মণিব্যজন, রত্নপাদুকা ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করে ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবিরবিলাসিনীরা, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভৃঙ্গার-হস্তে কর্ম্মান্তিকেরা, বিতানের তলদেশ থেকে বৃংহিতের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানাল রাজহস্তী মদবর্ষী 'গন্ধমাদন'।

শিবিরসন্নিবেশের যদি উপমা দিতে হয় তবে উপমান করা যেতে পারে মহাসমুদ্রকে ;

মহাসমুদ্রে মহাশৈলের মত সেখানে বসেছিল গন্ধমাদন,
বেলা রচনা করে দাঁড়িয়েছিল যামহস্তীর দল,
কল্লোলের কল্পনা জাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সম্ভ্রান্ত পরিজন,
আবর্ত্তের সন্দেহ জাগাচ্ছিল মণ্ডলে মণ্ডলে প্রাহরিক সৈন্যপ্রহরী।

প্রণামগ্রহণ করতে করতে শিবিরাভ্যন্তরের বাসভবনে প্রবেশ করে ক্লান্ত অঙ্গটিকে এলায়িত করে দিল চন্দ্রাপীড়—শয়নীয়ে।

ধীরে অঙ্গ মর্দ্দন করে দিতে লাগল সংবাহক,

বাজিত হল চামর।

কিন্তু দুঃখাসিকা—বেদনার কঠোরতা—রজনীজাগরখিন্ন চন্দ্রাপীড়ের নয়নে নামতে দিল না সুপ্তিকে।

চন্দ্রাপীড়ের মন বলছে—

"যদি বৈশম্পায়নের সন্ধানে আমি এখান থেকেই চলে যাই, আর উজ্জয়িনীতে ফিরে যায় শূন্য স্কন্ধাবার, তাহলে অন্ত থাকবে না পিতামাতা, শুকনাস, মনোরমাদেবীর শোকের। বৈশম্পায়নকেই অনুকরণ করবে আমার এই হঠকারিতা। তার চেয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে বৈশম্পায়নের সন্ধানে বেরব। অনুমতি পাবই। সঙ্গে সঙ্গে, বৈশম্পায়নকে সঙ্গে নিয়ে হেমকূটে কাদম্বরীর নিকট যাবার পথও আমার নিরঙ্কুশ হবে। বৈশম্পায়নের না আসা দেখছি, শাপে বর হয়েই দাঁড়াল।"

একটি সূক্ষ্ম আনন্দের অনুভূতি স্ফুট হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের তরঙ্গিত গণ্ডে।

কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের আশায় পুলকিত হয়ে উঠল অঙ্গ। শেষে যখন—দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—এই সংবাদ ঘোষণা করে দিয়ে ধ্বনিত হল যামঘোষা শঙ্খ তখন চন্দ্রাপীড় সমাধা করল শরীরস্থিতি।

এমন সময় দেখা গেল, যে চন্দ্রাপীড়ের অন্তরে মদনানল ও বৈশম্পায়নের বিরহ-শোকাগ্নি জ্বলছে, সেই চন্দ্রাপীড়কে বাহির থেকেও সন্তাপিত করবার অভিপ্রায়েই যেন সূর্যদেব উঠলেন মধ্যগগনে—রজতদ্রাবের মত ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর উত্তপ্ত কিরণজাল। অসহ্য হয়ে উঠল মধ্যাহ্নসূর্য্যের বিলাস।

শরীর ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করতে লাগল রৌদ্রের কণিকা;
সঙ্কীর্ণ হল পুঞ্জিত প্রাণী পাদপচ্ছায়া;
দুঃস্পর্শা হল ভূমি,
স্বর্ণবর্ণ হয়ে গেল দিগ্বধূদের মুখ।

শিবিরভবন থেকে চন্দ্রাপীড় দেখতে পেল—

রাজপথ জনহীন,
জলসত্রে জটলা বেঁধেছে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা,
নীড়াশ্রয়ী বিহঙ্গদের বিবৃত চঞ্চুপুটে নাড়াক্ষম শ্বাস,
পঙ্কোৎখাত করে মৃণাল ছিঁড়ে দলে বেড়াচ্ছে হাতীদের দল
—আকাশে উড়িয়ে পদ্মবনের মধুগন্ধি রেণু; আর
তামরসের মত রাঙা হয়ে উঠেছে মেয়েদের গাল।

ক্রমে চন্দ্রাপীড়ের অসহ্য বোধ হতে লাগল
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দাহ।
মনে পড়তে লাগল হিমস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার কথা,
বরণ করে নিতে ইচ্ছা হল মেঘেভরা বর্ষার আর্দ্রতা,
কখন দিনান্তে আসবে সন্ধ্যা—এই হয়ে দাঁড়াল সাগ্রহ কামনা।

শেষে শিবিরভবন থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করল জলমণ্ডপে। জলমণ্ডপটা—

রৌদ্রদিগ্ধ দিবসের যেন মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ,

সরোবরের যেন হৃদয়, মেঘঋষিদের যেন আশ্রম।

এমনি সেই সরোবরের তীরদেশে মণ্ডপটীর পরিকল্পনা। উৎসমুখে সরোবর থেকে জল উঠে ফুর্‌ফুর্‌ করে সিক্ত করে দিচ্ছিল মণ্ডপটাকে, জুড়িয়ে দিচ্ছিল দিনের দাহ। মণ্ডপের অন্তরে মেঘের ছায়ার মত অন্ধকারের জটিলতা।

জলজম্বুর দীর্ঘপল্লব আর শৈবাল-প্রবালের মঞ্জরী থেকে টুপ্‌ টাপ্‌ করে ঝরে পড়ছিল বিন্দু বিন্দু জল,

স্তম্ভসঞ্চয়ের চতুর্দ্দিকে পুষ্পিতবল্লরীর স্নিগ্ধ বন্ধন, আর ফুটন্ত অরবিন্দের ছিন্ন পাপড়ির সৌরভে ঘরখানি প্রসন্ন।

চন্দ্রাপীড় জলমণ্ডপে প্রবেশ করতেই—লঘুপদে ছুটে এল জলদেবীদের মত পরিচারিকার দল

সদ্যস্নানে সিক্ত তাদের চিকুর

সুরভি কোমল আর্দ্র বসনে অঙ্গ তাদের সুপ্রকাশ

বক্ষে দ্রবচন্দনের পত্রলতা।

কারো হাতে শৈবালের পল্লব,

কারো মৃণালের তালবৃন্ত,

নলিনীপত্রে কেউ বহন করে দাঁড়াল কর্পূর, কেউ পটবাস, কেউ হরিচন্দন, কেউ করপল্লবে ধারণ করে রইল চন্দ্রকান্তমণির মুকুর।

জলমণ্ডপের শীতল পরিবেশের মধ্যে কোন রকমে কেটে গেল চন্দ্রাপীড়ের দীর্ঘ দিন; কিন্তু এত রমণীয়তাও শান্ত করতে পারল না চন্দ্রাপীড়ের চিত্তজ্বর, এত জলসেকও নির্ব্বাপিত করতে পারল না হৃদয়-জোড়া হুতাশন—আশা এবং বিরহে প্রবল।

তারপর যখন লোহিতায়মান হল সায়াহ্ন, স্তিমিত হয়ে এল বর্ণের বহুলতা তখন চন্দ্রাপীড় আহ্বান করল রাজন্যদের।

বাসভবনের অঙ্গনে সভা বসিয়ে মৃদুসমীরকম্পিত শুভ্র পুষ্পরাশির দিকে দৃষ্টি রেখে আদেশ দিল

"রজনীর দ্বিতীয় যামে যাত্রা স্থির হোলো ; প্রস্তুত হোন্ সকলে।"

পরে কথায় কথায় উঠল বৈশম্পায়নের কথা।

দেখতে দেখতে তারা ফুটে উঠল আকাশে।

•

প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল স্কন্ধাবার।

প্রয়াণ-নান্দী সমাপ্ত হতে না হতেই যাত্রা করল বাহিনী।

উজ্জয়িনীর পথে যখন চন্দ্রাপীড় মুখ ফেরাল ইন্দ্রায়ুধের তখন অতীত হয়ে গেছে রজনীর তৃতীয় যাম।

পথে পথেই ক্ষীণ হয়ে এল রাত্রি।

অন্ধকারের হৃৎপদ্মে ছড়িয়ে পড়ল আলোকের আভা—মনে হল ধরণীর মোহনিদ্রা যেন ভাঙছে ;

কুয়াসার উত্তরীয় ভেদ করে ক্রমে দেখা গেল জগতের মুখ ; ধরা পড়ে গেল যা নিম্ন, যা উন্নত ;

বিরল হয়ে এল বনের গহনতা ;

প্রাচীলতায় নীহারের স্পর্শ পেয়েই যেন ফুটে উঠল দিগন্তকে অরুণ করে দিয়ে নবপল্লবের সমারোহ।

যখন উজ্জয়িনীতে পৌঁছল চন্দ্রাপীড়ের বাহিনী তখন প্রভাত হয়েছে—পূর্ব্বদিগ্বধূর ললাটফলকে সিন্দুরবিন্দুর মত শিশুসূর্য্যের লীলা।

উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করে চন্দ্রাপীড় লক্ষ্য করল সকলের মুখে বৈশম্পায়নের কথা।

বাহিনীকে অভ্যর্থনা করতে যারা এসেছিল তাদের সকলেরই মুখে কেমন একটি উদাস বর্ণহীন দীনতা। মহান্ একটা আকুতিতে মুখর যেন জনতা। যারা মুনি, যার মুমুক্ষু, যারা বীতরাগ, যারা নিঃস্পৃহ, এমনকি যারা দুর্জন তাদের মুখেও

বৈশম্পায়নের কথা। সমস্ত নগরীর যেন হারিয়ে গেছে একটী স্নিগ্ধতম নিবিড়তম বন্ধু।

"যারা পুরবাসী তাদের যদি এমন অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে যারা কোলে করে বৈশম্পায়নকে মানুষ করেছে, যারা বুক পেতে সহ্য করেছে তার শৈশবের মধুর অত্যাচার তাদের না জানি কি অবস্থাই দেখব। বৈশম্পায়ন নেই, কেমন করেই বা সামনে গিয়ে দাঁড়াব অমাত্য শুকনাসের, আর্য্যা মনোরমার।" চিন্তা করতে করতে চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করল উজ্জয়িনীতে—প্রণামনত জনতার প্রতি মুখ না ফিরিয়ে, নাসাগ্র থেকে না তুলে নিয়ে তার অশ্রুসজল দৃষ্টি। সম্রাটের প্রাসাদ-দ্বারে ইন্দ্রায়ুধ থেকে অবতরণ করতেই শুনতে পেল "মহাদেবী বিলাসবতীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ গেছেন আর্য্য শুকনাসের ভবনে।"

শুকনাসভবনে প্রবেশ করতেই চন্দ্রাপীড়ের কর্ণে ভেসে এল মাতা মনোরমার বিলাপ। কত সাধ, কত আশা, কত মিনতিতে ভরা সেই বিলাপ। ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য মায়ের সে কি করুণ নিবেদন!

চন্দ্রাপীড় দেখতে পেল মহাদেবী বিলাসবতী শোকবিহ্বলা মনোরমাকে অশ্রুস্নাত কণ্ঠে অনেক সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

শোকের করুণতায়, প্রলাপবিষে বিহ্বল হল চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত—নিদ্রাগমের পূর্ব্বে যেমন অলস শিথিল হয়ে আসে অঙ্গ তেমনি হল তার চেতনার দশা।

কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে অধোমুখে প্রবেশ করল সেইখানে যেখানে নিস্পন্দ-সর্ব্বাঙ্গ মন্দার পাহাড়ের মত শুকনাস ছিলেন বসে। পিতাকে দেখে চন্দ্রাপীড়ের মনে হল তিনি যেন মন্থনশেষের স্তিমিত মহাসমুদ্র। প্রণাম সেরে চন্দ্রাপীড় উপবেশন করল দূরে।

ক্ষণকাল পরে আসন্নবর্ষণ জলধরের মত বাষ্পভরগদগদ ধ্বনিতে চন্দ্রাপীড়কে সম্বোধন করে মহারাজ তারাপীড় বললেন

"চন্দ্রাপীড়, জানি তুমি তোমার নিজের জীবনের চেয়েও তোমার ভাইকে অধিক স্নেহ করতে। জানি, যাকে সব চেয়ে ভালবাসা যায়, তার কাছ থেকেই অতর্কিতে পেতে হয় সব চেয়ে বড় রকমের দুঃখ! তখন কিইবা না, না করা

যায় ? কিন্তু বৈশম্পায়নের এই ব্যাপার,—যে ব্যাপার তার জন্ম, তার স্নেহ, তার শীল, তার বিনয়ের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অনুচিত, আমার মনে হচ্ছে—সে বিষয়ে তোমার যেন কোথায় কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে ; হয়ত বা তোমার পক্ষ থেকে ঘটেছে কোন অসম্ভাবনীয় অনাচার ।"

চন্দ্রাপীড়ের উপর দোষারোপ !

সম্রাটের মুখ দিয়ে এমন কথা নির্গত হতে পারে ভাবতে পারেননি শুকনাস। শোকে এবং দুঃখে অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর মুখ, নয়নের সীমায় বিদ্যুতের মত কেঁপে উঠল ভ্রূ। স্ফুরিতাধরে তিনি বললেন

"বন্ধু, আমার বিশ্বাসই হয়না যুবরাজের এ বিষয়ে কোনো দোষ থাকতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে বলব উষ্ণা আছে চাঁদে, আগুনে আছে হিম, সূর্য্যে আছে অন্ধকার।

কৃতঘ্ন কর্ম্মচণ্ডাল এমন পুত্রের হীন আচরণে চন্দ্রাপীড়কে যে শাস্তি ভোগ করতে হবে অবমাননা—এ অসহ্য।

জন্মাবধি দেবী বিলাসবতী যাকে কোলে ক'রে মানুষ করেছেন, যাঁর স্নেহমমতাকে উপেক্ষা করতে দ্বিধা করেনি সেই কৃতঘ্ন, বাতাসের মত চঞ্চল যার প্রকৃতি, তাকে নিয়ে কী করতে পারে চন্দ্রাপীড় ?"

তারপরে ক্ষণকাল আবিষ্টের মত স্তব্ধ থেকে শুকনাস বললেন

"বয়স্য, তুমি জাননা—এইরকম কটু ক্রূর স্বভাব নিয়ে জন্মায় কতকগুলো ক্ষুদ্র প্রাণী ;—স্নেহ দিয়ে যদি তাদের বশ করতে চাও তাহলে দেখবে বেড়ে যাচ্ছে তাদের পরুষতা। যদি স্নেহ দিয়ে সকলঙ্ক কৃপাণকে ধৌত করা যায় তাতে তার ধার বাড়ে বই কমে না। অনাচার এদের চরিত্রগত ধর্ম্ম।

এরা সরলে কুটিল, স্নিগ্ধে রুক্ষ, বিশ্বাসে হন্তা, দুর্ব্বলে মারমুখ, বিনীতে উদ্ধত। নীচ এদের কাছে উচ্চ।

গুরু হয়ে যায় লঘু, ন্যায় হয়ে দাঁড়ায় অন্যায়, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা।

এতই ক্ষুদ্র এদের মন যে প্রজ্ঞাকে এরা কাজে লাগায় অন্যের উৎসন্নের জন্য—জ্ঞানের প্রসারের জন্য নয় ;

ঐশ্বর্য্যকে কাজে লাগায় চিরমৈত্রীর জন্য নয়—ব্যসনের আসক্তিতে ;
ধনত্যাগ তারা করে কিন্তু ধর্ম্মের জন্য নয়—কামের জন্য।
বন্ধু, পুত্রের দশা হয়েছে এদেরই মত।
তা না হলে—এত বড় হতভাগ্য সে,—একবার তার মনেও হলনা সুহৃদ্ চন্দ্রাপীড়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ করা ভুল, সম্রাট্ তারাপীড়ের রোষাগ্নিতে পতঙ্গের মত সে দগ্ধ হতে হতে পারে, বংশের সে একমাত্র সন্তান, মায়ের সে নয়নের মণি।
দেখেও যে না দেখবে সে অজ্ঞান সে অন্ধকে নিয়ে কী করা যেতে পারে? তার চোখ ফোটাব কেমন করে?
মহারাজ, বৈশম্পায়নকে আপনি শুকপাখীর মত পড়িয়ে পুস্ট করেছেন; ও শিকলকাটা জাত।
শুকপাখী তবু আনন্দ দেয়, যে পোষে তাকে ভালবাসে, পরিচয় মানে, তাদেরও থাকে মাতাপিতার উপর সহজস্নেহ, কিন্তু সেটুকু গুণও নেই এই দুর্জাত বৈশম্পায়নের—একেবারে রসাতলে গেছে। আমি এই বলে রাখছি তির্য্যগ্-যোনিতে তাকে জন্ম নিতে হবে পরজন্মে।"
এই কথা বলতে বলতে আর বলতে পারলেন না শুকনাস। পাঁজর চিরে যেন বইতে লাগল দীর্ঘনিঃশ্বাস, ক্রোধে কাঁপতে লাগল বাক্যশোষী অধর, উদ্বাষ্প নয়ন দুটিকে দেখে মনে হল হেমন্তপ্রাতের শিশিরাহত যেন যুগল পদ্ম।

ধীরে ধীরে শুকনাসকে সান্ত্বনা দিয়ে তারাপীড় বললেন

"শুকনাস, তোমাকে জ্ঞান দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি দিয়ে সমুদ্রকে পূর্ণ করা যায় না, ঝড় বহানো যায়না চামরের বাতাসে, প্রদীপের আগুনকে দেখিয়ে সূর্য্যকে যায়না চেনানো।
তুমি প্রাজ্ঞ, বিবেকী, ধীর, তোমাকে আর কি বলব—কিন্তু দুঃখদেবতা যখন নামেন তখন চিত্ত যতইনা কেন বিশুদ্ধ হোক, মলিন হয়ে ওঠে—যেমন সরোবরের জল আবিল হয় বর্ষার ধারাপতনে। চিত্তের স্বচ্ছতা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নস্ট হয়ে যায় সাধারণ জ্ঞান। তখন পারম্পর্য্যবোধ থাকেনা, জড় হয়ে ওঠে বুদ্ধি, নিজেকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয় বিবেক।

সেই জন্যেই তোমাকে উপদেশ, আশ্বাস দিতে সাহস পাচ্ছি।

লৌকিক ব্যাপার আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী বোঝ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখনও কি এমন দেখেছ,—যৌবনে বিকার আসেনি ?

যৌবনের আবির্ভাবে শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে গলে ঝরে যায় গুরুজনদের উপর শ্রদ্ধা, মমতা, ভালবাসা। নূতন একরকমের মোহ নূতন একরকমের প্রীতি পেয়ে বসে যৌবনকে।

বক্ষের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, বেড়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষা ;

বলবীর্য্য নিয়ে আসে মত্ততা ;

পেশীর স্থূলতার সঙ্গে সঙ্গে স্থূল হয়ে যায় বুদ্ধি,

শ্মশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে মলিন মোহ।

ছেলেবেলাকার সাদা পদ্মের মত চোখ—বড় হয়—টানা হয়—কিন্তু বন্ধু, আমি দেখেছি,—যৌবনের সেই ডাগর অরুণ চোখ তলিয়ে দেখতে শেখেনা, দূরদর্শী হয় না।

আর প্রেম যদি একবার হৃদয়ে স্থান পায় তাহলে কোথায় বিস্মৃতির রসাতলে তলিয়ে চলে যায় পৃথিবীর অন্য সমস্ত বিদ্যা।

সে চঞ্চল প্রকৃতিকে নিরাশ্রয় করে স্থৈর্য্য,

উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় সেই প্রকৃতি।

তার যে স্খলন হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আবার স্খলন—যদি ধরা পড়ে যায়, জানা হয়ে যায় সকলের, তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে খসে পড়ে সব লজ্জা।

কে না জানে, লজ্জার আবরণ-হারা হৃদয়ে সমস্ত অবিনয়ের হেতু দুর্ণিবার কুসুমধন্বার অবারিত গতি ?

হৃদয়টাতে শতছিদ্র করে দেন পুষ্পবাণ ;

সেই ছিদ্রপথে বিনয়, শীল, গাম্ভীর্য্য নিঃসাড়ে ঝরে যায়। বিদ্রোহ করে ওঠে ইন্দ্রিয়। তখন আর তাকে রাখা যায় না। খেয়াল থাকে না তার স্থান, কাল, পাত্রের।

শুকনাস,—তাদের কাছে তোমার 'অন্বয়ব্যতিরেক'-ন্যায় অচল। তারুণ্যের

এইটাই হচ্ছে সাধারণধর্ম্ম। এই বয়সে দুর্বিলাসের একাধিপত্য—সাধারণ-ধর্ম্মকে উল্টিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়।

সেইজন্যেই বলছি নিজের ছেলের উপর এতটা ক্রোধ করা অনুচিত। দুঃখের আবেশে ছেলেকে অভিশাপ দেওয়া তোমার মত জ্ঞানীর সাজে না। পিতৃমাতৃ-স্থানীয় গুরুজনদের মুখ থেকে স্বপ্নেও যদি কোন ভাষা বেরোয়—শুভই হোক্ অশুভই হোক্ সে ভাষা, তার ফল সন্তানে অবশ্যই ফলে। আশীর্ব্বাদ যেমন কল্যাণ নিয়ে আসে আক্রোশ নিয়ে আসে তেমি অভিশাপ।

সত্যই, শুকনাস—তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। অঙ্গ থেকে যে জন্মেছে তার কথা ছেড়ে দাও, নিজের হাতে একটা গাছ পুঁতলে তারই উপর যে কতটা স্নেহ পড়ে তা ত কারোর অবিদিত নেই।

বৈশম্পায়নের উপর এ তোমার মিছে রাগ।

সে ত বলতে গেলে বিরুদ্ধাচরণ কিছু করেনি।

"সর্ব্বত্যাগী হয়ে সে রয়ে গেল"—কেন এলনা, তার কারণটি পর্য্যন্ত না জেনে কেমন করে দোষারোপ করি?

এমনও ত অনেকবার দেখেছি, যেটাকে আমরা দোষ বলে স্বীকার করে নিয়েছি সেটা শেষে গুণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাকে নিয়ে আসি চল। তারপর না হয় তোমার ঐ দুষ্ট ছেলেকে দণ্ড দেওয়া যাবে।"

মুখ নত করে শুকনাস বললেন—

"বৈশম্পায়নকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই আপনি দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না তার দোষ। সব ছেড়ে দিন—শুধু এইটুকু আমাকে বলুন—যুবরাজের আদেশ অমান্য করে ক্ষণকালও সে যদি—অন্য জায়গায় রহে যায় সেটা কি তার দোষ নয়? বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?"

যুবরাজের আদেশ অমান্য করেছে—বৈশম্পায়নের বিরুদ্ধে এই নব অভিযোগ—যেন কশাহত করল চন্দ্রাপীড়কে।

স্রোতকে ফিরিয়ে আনবার অভিপ্রায়ে চন্দ্রাপীড় তখন ধীরে ধীরে শুকনাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল

"আর্য্য, আমার ত্রুটিতেই বৈশম্পায়ন আসেনি—এই কথা স্বয়ং মহারাজ বলতে পেরেছেন, তখন অন্যলোকের পক্ষেও সে অভিযোগ করা আশ্চর্য্য নয়। লোকে যদি মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তাহলে মিথ্যাও সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর যদি গুরুজনেরা অনুমোদন করেন তাহলে ত কথাই নেই। সেইজন্য অনুরোধ করছি এই দোষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। আমাকে আজ্ঞা দিন যেমন করে হোক্ বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এ আজ্ঞা না দিলে আমার দোষ শুদ্ধি হবে না। বৈশম্পায়ন যদি না আসে তাহলে বদ্ধমূল হয়ে যাবে পিতার ধারণা।

একমাত্র আমিই বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে আনতে পারি। আর কেউ পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস; কারণ তাহলে পিতা যাদের উপদেশ লঙ্ঘন করেন না এমন অনেক রাজন্য বৈশম্পায়নকে সেইদিনই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন।

ইন্দ্রায়ুধে সেখানে পৌঁছতেও আমার বিশেষ কষ্ট হবে না, কারণ সে পথ আমার জানা।

বৈশম্পায়ন স্কন্ধাবার নিয়ে পিছনে পিছনে আসবে—এই ভরসাতেই তাকে ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলুম। জন্মাবধি একসঙ্গে বেড়েছি, হেসেছি, খেলেছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি, একসঙ্গে জেগেছি—এখন যদি বৈশম্পায়নের এই ব্যাপার শুনেও তাকে না আনতে যাই তাহলে—"

চন্দ্রাপীড়ের বাক্যের অবসান হতে না হতেই তাকে বাধা দিয়ে রক্তপদ্মের মত বেদনারঞ্জিত তার মুখখানির উপর নিজের সপক্ষপাত ষট্পদাবলীনিভ দৃষ্টি সংস্থাপন করে শুকনাস মহারাজকে অনুনয় করে বললেন

"যুবরাজ বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার আদেশ প্রার্থনা করছেন; মহারাজ যা আদেশ করেন।"

ক্ষণিক চিন্তার পর ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন তারাপীড়

"গত তিনবৎসর ধরে অমি আশা করে বসেছিলুম চন্দ্রাপীড় ফিরলে তার

বিবাহ দেব, বধূরাণীটিকে ঘরে নিয়ে আসব। কিন্তু দেখছি বিধাতা এখন অন্তরায়। চন্দ্রাপীড় ছাড়া অন্য কেউ বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বৈশম্পায়ন না এলে চন্দ্রাপীড়ও এখানে থাকতে পারবে না। যাত্রার আয়োজন করুন। তবে অনেক দূর যেতে হবে, গণকদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাই বিধেয়।"

তারপরে চন্দ্রাপীড়ের দিকে দৃষ্টি ফেলে চন্দ্রাপীড়ের বিনয়াবনত অংসদেশে শিরে, এবং বাহুতে সস্নেহ পাণিস্পর্শ করে বললেন

"মাকে একবার জানিয়ে যাস।"

শুকনাসকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ স্বভবনে প্রস্থান করলেন। যাত্রার আদেশটিকে কাদম্বরীর অক্লিষ্টবর্ণ বরণমাল্যের মত হৃদয়ে দুলিয়ে নিয়ে চন্দ্রাপীড় বিদায় নিতে গেল মাতা বিলাসবতী ও মনোরমা দেবীর নিকটে।

মনোরমা তাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

একটি ছেলে চলে গেছে—পাছে আবার চন্দ্রাপীড়েরও কিছু ঘটে—এই ভয়ে এ ছেলেটিকেও ছেড়ে দিতে তিনি একবারেই অনুৎসুক। শেষে অশ্রুস্নাতা দেবী বিলাসবতী যখন তাঁকে বোঝালেন যে চিরদিন পুত্রের মলিন মুখ দেখার চেয়ে দু চারদিনের জন্য পুত্রের অদর্শন সহ্য করা কঠিন হবে না তখন তিনি নিরস্ত হলেন। অনেক মিনতি সাধ্যসাধনার পর দেবী বিলাসবতী আর্য্যা মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন চন্দ্রাপীড়ের যাত্রামঙ্গল-সংবিধানের উদ্দেশ্যে।

শ্রীমণ্ডপে ফিরে এসে চন্দ্রাপীড় তৎক্ষণাৎ আহ্বান করল গণকদের। গোপনে তাদের ডেকে নিয়ে বলল

"পিতৃদেব বা আর্য্য শুকনাস জিজ্ঞাসা করলে বলবেন—দিন ভাল আছে। দেখবেন যেন আমার যাত্রার বিলম্ব না ঘটে।"

উত্তর দিলেন গণকেরা—

"দেব, গ্রহগণের যেরূপ স্থিতি লক্ষ্য করছি, তাতে আপনার যাত্রার কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে—কর্ম্মানুরোধে

রাজেচ্ছাই হচ্ছে কাল। দিনগণনার প্রয়োজন থাকে না। রাজাই কালের কারণ। কথায় বলে—মন চলে ত যা।”

“তাহলে পিতৃদেবের আদেশ অনুসারে আপনাদের একথা জানাচ্ছি, আগামী কালই যাতে আমার যাত্রা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করবেন।”

‘যুবরাজের যেমন অভিলাষ।”

গণকেরা প্রস্থান করলে চন্দ্রাপীড় সমাধা করল শরীরস্থিতি। মৌহূর্ত্তিকেরা পুনঃপ্রবেশ করে জানিয়ে গেলেন—‘যুবরাজের আদেশমতই কার্য্য হয়েছে। আর্য্য শুকনাসও তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। আগামী কল্য দিবাগতে রাত্রিতে যাত্রা বিধেয়।” বৈশম্পায়ন ও কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনস্বপ্নের আনন্দে, ইন্দ্রায়ুধের সমচাল অশ্বরত্ন ও অশ্বারোহী রাজপুত্রদের সন্ধানে ও নির্ব্বাচনে অতিবাহিত হয়ে গেল চন্দ্রাপীড়ের একটি রাত্রি ও একটি দিন।

পরদিন যখন সূর্য্যাস্ত হল,

সহমরণে যাবার অভিপ্রায়ে পশ্চিমদিগ্বধূ দিগন্তে জ্বালিয়ে দিলেন শ্মশানবহ্নি,

সন্ধ্যানলের স্ফুলিঙ্গের মত চমকে উঠল নক্ষত্র,

নীড়ে ফিরে এল পাখী,

তারপর যখন ধীরে ধীরে জন্মজন্মান্তর থেকে ভেসে আসা নক্ষত্রদের সঙ্গসুখ অনুভব করতে করতে উদয়গিরির শিখরে উঠলেন ভগবান শ্রীনক্ষত্রনাথ,

তখন চন্দ্রাপীড় যাত্রামঙ্গল-সংবিধানের উদ্দেশ্যে এল মাতৃদেবীর প্রাসাদে।

যাত্রামঙ্গলের সময় চোখের জল ফেলা নিষিদ্ধ।

তবু মহাদেবী বিলাসবতীর অপাঙ্গে টলটল করে উঠল অশ্রুবিন্দু—বিলীয়মান হৃদয়ের যেন বেদনার কণা।

মাতাকে প্রণাম করে যখন চন্দ্রাপীড় উঠে দাঁড়াল তখন বিলাসবতী তাকে বললেন

“চন্দ্রাপীড়, তুই যখন প্রথমবার আমাকে ছেড়ে চলে যাস্ তখন কেন জানি, এবারকার মত এতটা আকুল হয়ে ওঠেনি আমার মন। এবার যেন আমার বুকটা আরও বেশী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। মন স্থির করে রচনা করতে পারিনি

যাত্রামঙ্গল কি জানি আমার কী হবে। বুঝতে পারছিনা কেন হৃদয় এত আকুল হল! অনেকদিন পরে ফিরে আবার এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিস—তাই কি? না, বৈশম্পায়ন আমার হৃদয়কে বড় আঘাত দিয়েছে বলে? তোকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছেনা। তবু তোকে যেতে হবে। এইটুকু দেখিস্ আগেকার মত যেন এবার ফিরতে তোর দেরী না হয়।"

চন্দ্রাপীড় নিবেদন করল—

"মা, সেবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলুম—তাই ফিরতে দেরী হয়েছিল এবার শুধু বৈশম্পায়নকে নিয়েই ফিরে আসব—দেরী হবে কেন?"

মাতার নিকট বিদায় নিয়ে চন্দ্রাপীড় গেল পিতার নিকট বিদায় দিন।

সম্রাট্ তারাপীড়কে নিবেদন করল দ্বাররক্ষী—"যুবরাজ মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছেন।"

শয্যাতল থেকে পূর্ব্বকায় উন্নমিত করে কুমারকে আহ্বান করে তারাপীড় নিজের পার্শ্বে তাকে বসালেন।

নয়ন যেন তাকে পান করতে লাগল, বাৎসল্য দিল গাঢ় আলিঙ্গন।

অন্তঃক্ষোভে আক্ষিপ্ত-অক্ষর তারাপীড় কুমারকে বললেন

"চন্দ্রাপীড়, পিতা হয়ে আমি যে-সেদিন তোমার উপর দোষারোপ করেছি তার জন্যে মনে এতটুকুও দুঃখ পোষণ করে রেখোনা। শিক্ষার সময় থেকেই তোমাকে আমি পরীক্ষা করে চলেছি। মনে রেখো, গুণাগুণ পরীক্ষা করেই তোমার উপর রাজ্যভার আমি অর্পণ করেছি:—কেবল তনয়-স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে নয়।

রাজত্ব করা হচ্ছে—পৃথিবীর বোঝা বহন করা। রাজ্য শাসন করতে হয় কুটিল রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে, পদে পদে সঙ্কট ঘটায় পর্ব্বতের মত অটল পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যেরা, রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে শাসননীতি ভেদাভেদ দণ্ডনীতির জটিলতা। নিখিল প্রজার আশা, আকাঙ্ক্ষা, মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয় বলেই রাজ্যভার এত গুরু এত দুর্ব্বহ।

রাজ্যলক্ষ্মী তাঁরই বশ্যতা স্বীকার করেন যিনি অবিবেকী নন, যিনি নিরুৎসাহ নন,

যিনি অধর্ম্মরুচি নন, শাস্ত্রের ব্যবহার যিনি জানেন, যিনি নির্জিতেন্দ্রিয়, যিনি সংবিভাগশীল।

জোর করে গুণ দিয়ে যে বেঁধে রাখতে পারে চঞ্চলাকে—রাজত্ব তারই।

এই সমস্ত বিশদরূপে আলোচনা করেই গুরুজনেরা অর্পণ করে থাকেন রাজ্যভার; সুতরাং বোঝা উচিৎ—আমার এতে কোনো দোষ নেই। আজ তোমায় বলব, চন্দ্রাপীড়, কোথায় তোমার দোষ ঘটেছিল। তুমি ছিলে দিগ্বিজয়ের একমাত্র নায়ক। দিগ্বিজয়ের শেষে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেচনা না করেই স্কন্ধাবারের রক্ষাভার বৈশম্পায়নের হাতে অর্পণ করে চলে আসা তোমার পক্ষে ভাল হয়নি। যে কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায়, সে কার্য্য শেষপর্যান্ত সমাধা করে তবে নিতে হয় বিশ্রাম, তবে নিতে হয় অবসর—তার পূর্ব্বে নয়।

আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু জেনে রেখো, আসন থেকে কখনও নড়িনি, গৃধ্নু হয়ে প্রজাপীড়ন করিনি, গর্ব্বভরে বা উত্তেজিত হয়ে কাউকে বিমুখ করিনি। নিন্দাকে ভয় করেছি কিন্তু ডরাইনি মরণকে, পৃথিবীর যা কিছু দুষ্প্রাপ্য তা ভোগ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু নিজের কাজের অবহেলা কখনও করিনি।

যৌবনের উন্মাদনাকে বড় করে দেখে রাজকার্য্যকে এড়িয়ে চলা ভাল নয়। সেই জন্যেই চন্দ্রাপীড়, এ জন্মে পেয়েছি পরম কৃতার্থতা।

শেষ একটি বাসনা ছিল—তোমার বিবাহ দিয়ে রাজ্যের সম্পূর্ণভার তোমার হাতে তুলে দিয়ে চলে যাব—যে পথে পূর্ব্বরাজর্ষিরা চলে গেছেন জন্মনির্ব্বাহলঘু হৃদয় নিয়ে। কিন্তু এই শেষ বাসনা বোধ হয় যেন অপূর্ণই রয়ে গেল। অতর্কিতে কোথা থেকে বৈশম্পায়নের এই ব্যাপার এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এমন বৈশম্পায়নের যে এমন দশা হবে তা কি কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? না, বৈশম্পায়ন নিজে এমন কাজ করে বসতে পারে?

বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার অনুমতি তোমাকে আমি দিয়েছি—কিন্তু দেখো, তুমিও যেন কোনো রকমের বিভ্রম না ঘটিয়ে বস;

চন্দ্রাপীড়, আমার শেষ মনোরথ মনেই যেন না থেকে যায়।"

এই কথা বলে সম্রাট্ তারাপীড় নিজের উত্তানিত মুখ থেকে সম্পীড়িত হৃদয়ের মত চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করে চন্দ্রাপীড়ের অধরে স্পর্শ করে দিলেন।

চন্দ্রাপীড় বিদায় নিল।

শুকনাসমন্দিরে শূন্যশরীর শুকনাস এবং অশ্রুস্নাতা মনোরমাদেবীর নিকট সাশীর্ব্বাদ বিদায় নিয়ে চন্দ্রাপীড় উপস্থিত হল ইন্দ্রায়ুধের নিকটে।

সাদরে গ্রীবা পরামৃষ্ট হলেও ইন্দ্রায়ুধের কেমন যেন লক্ষিত হল ভাববৈচিত্র্য।

নৃত্য করে উঠল না সে আনন্দে ;
স্তব্ধ তার হর্ষহ্রেষা ;
উত্তানিত হল না কর্ণকোষ ;
নিরুৎসাহ যেন ক্ষুরখনন।

ইন্দ্রায়ুধের দীনভাব লক্ষ্য করে বিচলিত হল চন্দ্রাপীড়। পাছে শুকনাস যাত্রায় বাধা দেন এই ভয়ে, পাছে বৈশম্পায়ন এবং কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের বিলম্ব ঘটে যায় এই আশঙ্কায়, চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধকৃত এই অশুভ শকুন অগ্রাহ্য করেই দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল উজ্জয়িনীর পরিবেশ থেকে।

শিপ্রাতটে প্রস্থানমঙ্গলের জন্য যে তৃণমন্দির বিরচিত ছিল তাতে প্রবেশ না করেই ইন্দ্রায়ুধকে ছুটিয়ে দিল প্রবাসের পথে।

"এখানে না এসেই যুবরাজ চলে গেলেন"—সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

রাজপুত্রেরা অনুগমন করল চন্দ্রাপীড়ের।

যামিনীমুখে যখন চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধ থেকে নামল তখন দেখা গেল ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

প্রভাত হতে না হতেই জেগে উঠল চন্দ্রাপীড়, হৃদয়-জোড়া গভীর অশান্তি নিয়ে।

অবিশ্রান্ত চলা ;

নিশিদিন চলা ;

ভুল হয়ে যায় ক্ষুৎপিপাসা, গায়ে লাগেনা রৌদ্রের দাহ, জাগরবাথায় নুয়ে পড়েনা নয়নের পর্ণ।

এত ক্লেশ, এত চিন্তার মধ্যেও আনন্দমণির মত থেকে থেকে আলো ছড়িয়ে দিতে লাগল বৈশম্পায়নের কথা, কাদম্বরীর রহস্য।

চন্দ্রাপীড় ভাবে—

অচ্ছোদের তীরে একবার পৌঁছতে পারলেই হয়। তারপর দেখা যাবে সে কেমনধারা বৈশম্পায়ন। পিছন থেকে ধীরে ধীরে লঘুপায়ে কাছে গিয়ে যখন হঠাৎ জড়িয়ে ধরব তার কণ্ঠ তখন দেখব সে কী কথা বলে,—কোন্ মুখে সে বলে—'আমি ঘরে যাবনা'।

—তারপরে বৈশম্পায়নকে সঙ্গে নিয়ে যাব মহাশ্বেতার আশ্রমে ;—তিনিই পরিষ্কার করে দেবেন আমার গন্ধর্ব্বলোকে যাবার পথ। হঠাৎ আমাকে দেখে তাঁর খুসী আর ধরবে না ; নিশ্চয় প্রসন্নচিত্তে আমাকে নিয়ে যাবেন সেইখানে যেখানে রয়েছে আমার আনন্দের চরম নির্বৃতি। আশ্রমে সৈন্যসামন্তদের রেখে দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একলা চলে যাব হেমকূটে।—হেমকূট, কি মিঠে নাম!—হেমকূট আমাকে চিনতে পারবে। সম্ভ্রমভরে প্রণাম করে সরে দাঁড়াবে পরিজন। "আমি এসেছি"……এই কথাটি ফুলের মত ছড়াতে ছড়াতে দৌড়িয়ে ছুটে খবর দিতে যাবে সখারা, হাসির বাণ মেরে কাদম্বরীর অঙ্গ থেকে কেড়ে নেবে তার উত্তরীয়, কণ্ঠ থেকে খুলে নেবে তার মাল্য।

লজ্জায় নত হবে কাদম্বরীর চোখ, অধরে প্রশ্ন লেগে থাকবে "কোথায় সে, কে বলেছে, কত দূরে রয়েছে ?"

চন্দ্রাপীড় ভাবে

চোখের সামনে দেখতে পায়—

যেন তাকে দেখেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কাদম্বরীর বরাঙ্গ ঘিরে নেমে আসে এক অপূর্ব্ব বিরহ-নির্ব্বাণ সলজ্জ শান্তি ;

নলিনীপত্রের আবরণ ফেলে দিয়ে বক্ষের উপর তিনি দ্রুত টেনে দিলেন উত্তরীয়াংশুকের অঞ্চল;

ফেলে দিলেন কার্য্যশেষ মৃণালের আভরণগুলিকে,—আভরণের মত পূর্ণজ্যোতিতে ফুটে উঠল দেহের অপূর্ব্ব আভা, কেবল কণ্ঠটিকে বেষ্টন করে রইল বিরহের সাক্ষ্যস্বরূপ একখানি ক্ষুদ্র হার।

চলেছে চন্দ্রাপীড়ের ইন্দ্রায়ুধ।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চন্দ্রাপীড়ের কৈশোর-প্রেমের উদ্দাম কল্পনা।

—তারপর সখীরা কাদম্বরীর অঙ্গ থেকে ঘসে উঠিয়ে দেবে হরিচন্দনের গাঢ়চর্চ্চা, হারানো লাবণ্যটিকে ফুটিয়ে দিয়ে,

—পুলকোদ্গমে ঝরে ঝরে ক্ষরে পড়বে অঙ্গলগ্ন কমলকুমুদকুবলয়দলের কিঞ্জল্ক;

—কপোলসঙ্গিনী কবরীটাকে কাদম্বরী স্কন্ধদেশে রেখে দেবেন পদ্মহস্তের মৃদু ইসারায়;

—আর প্রেয়সীর উৎসৃষ্টচন্দন শুভ্র অঙ্গখানি আবেদন করে জানাবে—'নিভে গেছে আমার বিরহের আগুন'।

পদ্মশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন কাদম্বরী—চন্দ্রাপীড়ের নয়নের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

মনশ্চক্ষে চন্দ্রাপীড় দেখতে পায়—

ছুটে এল মদলেখা

চরণের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানাল পত্রলেখা

কেয়ূরকের সে কি আলিঙ্গনের দৃঢ়তা!

বিবাহের সাড়া পড়ে গেল চৌদিকে, গন্ধর্ববলোকে বেজে উঠল মহোৎসবের বাঁশরী; কাদম্বরীর করগ্রহণ করল চন্দ্রাপীড় যেমন করে করগ্রহণ করে সম্রাট্ বর্ষাভিষিক্ত ধরণীর।

ক্রমেই এই মানসিক বিবাহকল্পনা চন্দ্রাপীড়ের নিকট বাস্তব বলে মনে হতে লাগল। চন্দ্রাপীড় দেখতে লাগল সেই স্বপ্ন—যৌবনেই যা দেখা যায়—যে কথা মনে আসে অথচ বলা যায় না, সেই কথাগুলি ছবির মত ফুটে উঠতে লাগল চন্দ্রাপীড়ের মনে।

বাসভবনের পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে চন্দ্রাপীড়—ছড়ানো রয়েছে কুঙ্কুম, বেছানো রয়েছে ফুল, উঠছে গন্ধধূপের গুরুভার গন্ধ,

পালঙ্কের একান্তে বসে রয়েছে নতমুখী কাদম্বরী—বুঝেও যেন কিছু বোঝেনা এমনিতর তার ভাব। কিছুক্ষণ আলাপ জমিয়ে শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মদলেখা।

তারপর চন্দ্রাপীড় অনিচ্ছন্তী কাদম্বরীকে হাত ধরে নিয়ে এল—নিকটে, নিকট থেকে ক্রোড়ে, ক্রোড় থেকে হৃদয়ে, রোধ করল নীবিগ্রন্থিতে ছুটে-যাওয়া অকঠোর হাতখানিকে,—আত্মাকে বঞ্চিত করল না লজ্জায় নিমীলিত-লোচনে চুম্বনের মৃদুস্পর্শ না দিয়ে।

তারপরে এল দেবদুর্লভ অধর থেকে অমৃতের মন্থন।

এত কোমল তার বধূ—যে তাঁর প্রতি অঙ্গখানি চন্দ্রাপীড়ের দেহে যেন বিলীন হয়ে যেতে চায়!

সে বিলীয়মানতার কী অনবদ্য আনন্দ!

সে আনন্দ চন্দ্রাপীড়ের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেন মোহাভিভূত করে দিয়ে প্রসন্ন করে দিল, উদ্দীপিত করে দিয়ে এনে দিল মধুর নির্বৃতি।

সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ!

এ আনন্দের অনুভূতি এনে দেয় অনুভূয়মান স্পৃহা;
সহস্রবার অনুভব করলেও মনে জাগে না পুনরুক্তিদোষ; অতিস্পষ্ট অথচ অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ, যেন পরমধ্যানলব্ধ নির্ব্বাণ; বিশ্ব থেকে মুছে দিয়ে যায় বিরহের গাঢ় কালিমা।

ইন্দ্রায়ুধের পৃষ্ঠে এক অনাখ্যেয় আনন্দে শিউরে উঠল চন্দ্রাপীড়। হাসি পেল—তারপরে মনে মনে বললে—"দাঁড়াও না, মদলেখার সঙ্গে যদি বৈশম্পায়নের বিবাহ না দি তাহলে আমার নামই নয় চন্দ্রাপীড়।"

বিরহমিলনের কল্পনার মধ্য দিয়ে, না-ঘুম, না-তৃষ্ণা, ইন্দ্রায়ুধে চলল চন্দ্রাপীড়—অবিশ্রান্ত চলা, দিবারাত্র চলা।

এমন সময় অর্দ্ধপথে এল কালভুজঙ্গিনীর মত ঘনকৃষ্ণ বর্ষা।

যেন কোন দুর্দ্ধর্ষ শত্রু মুখ আঁধার করে পথরোধ করে দাঁড়াল

সূর্য্যের যেন রাহুগ্রাস,
মদনহস্তীর যেন উচ্ছৃঙ্খল যৌবন,
বজ্রানলের যেম ধূমোদ্গার।

উতলা হল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়।

বিদ্যুৎস্তনিত বর্ষার এই প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে প্রথমেই মনে জাগল শূন্যমনা কাদম্বরীর কথা।
বিরহিদের বড় পীড়া দেয় এই বর্ষা।
দিগন্তের নীলাঞ্জনবর্ণ বনলেখার দিকে মৌনদৃষ্টি ফেলে পথিকবধূরা বসে থাকে—আর ঘনান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করে মরণের।
হেমকূটেও কি তবে দেখা দিয়েছে দুরন্ত বর্ষা! তারপরে যখন তীক্ষ্ণ শরের মত চন্দ্রাপীড়কে বিঁধতে লাগল বর্ষার ধারাপতন তখন তার মনে হল 'দেবতা দাঁড়াচ্ছেন কেন আমার পথের কাঁটা হয়ে'?

দশদিক্ আঁধার করে প্রথমে এল চেতনাহারী মূর্চ্ছাবেগ, তার পরে ধেয়ে এল নবনীল ঘনিমা।
হৃদয় কোথায় উধাও হয়ে উড়ে গেল প্রথমে, তারপরে উড়তে লাগল মানসোৎক হংস,
প্রথমে এল দীর্ঘশ্বাসের পরিম্লান ঝঞ্ঝা, তারপরে বইল কদম্বচুম্বি সমীরণ;
সহস্র উদ্বেগ সহস্র উৎকণ্ঠায় প্রথমে পূর্ণ হল মন, অবসানে ভরল স্রোতস্বিনীর পাত্র।

আতুর হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়।
নদীর ক্ষুরধার জলভারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল মন্মথের উন্মাথ, বর্ষণ-বিলুলিত কমলবনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় ডুবে চলে গেল কাদম্বরী-দর্শন-দুরাশা।
কিন্তু চলার বিরাম রইলনা ইন্দ্রায়ুধের।

পথের ধার থেকে ছুটে আসে মালতী ফুলের গন্ধ—রণ রণ করে ওঠে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়, দীঘির তীর থেকে ভেসে আসে কেতকী ফুলের পরিমল—মর্ম্মকাটা তার পরিমল কেতকীর। তবু চলার বিরাম থাকেনা ইন্দ্রায়ুধের।

চিত্তের উপচীয়মান উত্তেজনাকে শান্ত করতে অনেক চেষ্টা করল চন্দ্রাপীড়। কিন্তু সমস্ত যেন বিফলে গেল।

আকাশদোলানো নবমেঘের গম্ভীর গর্জ্জন,

তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের বাচালতা,

খর্জ্জুরপত্রের দুরন্ত খড়খড় ধ্বনি,

কলাপীর উন্মুক্ত কেকা,

গিরিতে গিরিতে কল্লোলস্ফীত নির্ঝরের ঝর্ঝর ঝঙ্কার,

গুহায় গুহায় সংহত ঝম্‌ঝম্‌

তৃণের বুকে মৃদুমৃদু রিমিঝিমি—

এরা সবাই চন্দ্রাপীড়ের বিরুদ্ধে যেন ষড়যন্ত্র করে দাঁড়াল। রাত্রে নয়, দিনে নয়, গ্রামে নয়, অরণ্যে নয়, অন্তরে নয়, বাহিরে নয়, বৈশাম্পায়নের স্মরণে নয়, কাদম্বরীর ধ্যানেও নয়, কোথাও কিছুতেই যেন চন্দ্রাপীড়কে শান্তি পেতে দিল না। যে বিদ্যুতের চকিতদীপ্তিতে আলোকিত হয়ে ওঠে দশদিক্‌, চন্দ্রাপীড়ের মনে হতে লাগল—সে বিদ্যুৎ যেন মূর্চ্ছার মত অন্ধকার।

প্রকৃতির প্রত্যেকটি লীলা তাকে বাধা দিতে লাগল।

তর্জ্জনী তুলে বিদ্যুৎ বল্লে—"যেওনা,"

লৌহপ্রাচীরের মত কৃষ্ণবর্ণ মেঘদল পথরোধ করে দাঁড়াল, বল্লে—"যেওনা",

পৃথ্বী চমকিত মেঘের গর্জ্জনে জেগে উঠল ভৎর্সনা,

বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণে চারিদিকে রচিত হল ধারার পিঞ্জর। কিন্তু তবুও নিখিল প্রকৃতি নিগড়িত করতে পারল না চন্দ্রাপীড়ের অভিসার।

দুর্দ্দশার অন্ত রইলনা তুরঙ্গ সৈন্যের।

কোনরকমে অনুসরণ করে তারা চলতে লাগল চন্দ্রাপীড়ের আহার নেই বিহার নেই, ক্লান্তদেহে চলতে লাগল মৌনমুখ রাজলোক।

শেষে যখন পথের তিনভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন একদিন সহসা দেখা পাওয়া গেল মেঘনাদের।

কৃতনমস্কার মেঘনাদকে জিজ্ঞাসা করল চন্দ্রাপীড়—

"পত্রলেখার পৌছানোর খবর এখন থাক্। আগে আমাকে বৈশম্পায়নের খবর দাও।

অচ্ছোদ সরোবরের তীরে দেখা পেয়েছ কি বৈশাম্পায়নের? জিজ্ঞাসা করেছিলে—তার কি হয়েছে? প্রশ্নের সে কি কিছু উত্তর দিয়েছিল? না, আমাদের পরিত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথাও মন থেকে একেবারে দিয়েছে বিসর্জ্জন? আমার কথা কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল?"

মেঘনাদকে মৌন দেখে কিছুকাল স্তব্ধ থেকে চন্দ্রাপীড় বললে—"তবে কি তোমাদের মধ্যে কোনও বাক্যালাপ হয়নি? তবে কি বৈশম্পায়নকে জাগাবার কোনও চেস্টা তুমি করনি? তাকে কি বলেছিলে যে,—আমি আসছি, ফিরতেই হবে তাকে আমার সঙ্গে? ভগবান জানেন—কেমন করে সে যে দিন কাটায়।"

মেঘনাদ বললে—

"দেব, আমাকে যখন আপনি পত্রলেখার সঙ্গে পাঠান, তখন আপনি বলেছিলেন 'বৈশম্পায়নের সঙ্গে দেখা করে ইন্দ্রায়ুধে আমি হেমকূটে আসছি'। মাঝপথে যে আর্য্য বৈশম্পায়ন অচ্ছোদ সরোবরে চলে গেছেন—সে খবর আমার অবিদিত ছিল। এমন কথা পৌঁছয়নি আমার কানে।

এদিকে দেবী পত্রলেখা—অচ্ছোদ সরোবরে পৌঁছতে না পৌঁছতে আমাকে আদেশ দেন ফিরে যেতে। বললেন—'বর্ষা নেমেছে। দুর্দ্দিন। মহারাজ তারাপীড় নিশ্চয়ই কুমারকে আসতে দেবেন না। তুমিও ফেরার পথে কস্ট পাবে। তার আগেই বরং উজ্জয়িনীতে ফিরে যাও।' আমাকে একরকম জোর করেই বিদায় দিয়েছেন।"

"তাহ'লে কি এখনও পত্রলেখা হেমকূটে পৌঁছয় নি?"

মেঘনাদ বললে "কুমার, পথে যদি কোনো বাধা না ঘটে থাকে তাহলে আমার মনে হয় তিনি এতদিনে নিঃসন্দেহ হেমকূটে পৌঁছে গেছেন।"

মেঘনাদের কথায় আরও বৃদ্ধি পেল চন্দ্রাপীড়ের চিন্তা। যদি এই বর্ষার দিনে হেমকূটে না পৌঁছে থাকে পত্রলেখা! আমার মতই ত বিহ্বল হয়ে উঠতে পারে কাদম্বরীর চিত্ত! ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের অনুরাগের সাগর।
বিকৃত হয়ে দেখা দিতে লাগল প্রকৃতির রূপ—

এত মেঘ নয়—এরা যে কালপুরুষ ;
এত বিদ্যুৎ নয়—এরা যে বিরহানলের শিখা ;
বিষঢালা কেতকীর পরিমল ;
ময়ূরের কেকায় এ কোন কালদূতের আলাপ !

মেঘের গুরুগুরুধ্বনিতে চন্দ্রাপীড় শুনল কামদেবের জ্যানির্ঘোষ ; তরুর শাখায় শাখায় খদ্যোতের পুঞ্জেপুঞ্জে চন্দ্রাপীড় দেখতে পেল প্রলয়াগ্নির স্ফুলিঙ্গ ;
দিগন্তে-উড়ে-যাওয়া বলাকার শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রেতপতির উড়ন্ত পতাকা।

সমস্ত শরীর ব্যেপে নামল এক অজ্ঞেয় অবসাদ,—অরতি ; কাতর হয়ে উঠল আত্মা, শরীর মনে হল রক্তহীন।
অপূর্ব্ব দুঃখের তীব্র অনুভূতি মুখ চেপে ধরল হাসির, নয়নে বহাল অশ্রু, আলাপে আনল মৌনতা।
মনে হল, জীবনটাকে কে যেন শানে চড়িয়েছে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে, জর্জরিত করে দিয়েছে সহস্র রকমের অজ্ঞাত বেদনায়।
কল্পনার রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রাপীড় বারম্বার দেখতে পেল, আহা, যেন তারই মতন কাদম্বরীরও হয়েছে দশা—কণ্ঠলগ্ন প্রাণ।
দেখে একটু আশ্বস্ত হল।

মানসিক অবসন্নতা ও প্রমত্ততার ভিতর দিয়ে চন্দ্রাপীড় পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে শেষে

উপস্থিত হল অচ্ছোদ সরোবরের তীরে। অচ্ছোদের তীর তখন ক্লিন্ন হয়ে উঠেছে ধারাবর্ষণে।

প্লাবিত হয়ে গেছে তার তটপ্রান্তের হরিৎ শাদ্বল,
রোধোজলের অক্লান্ত আক্রমণে কলুষিত তার প্রান্ত,
নুয়ে পড়েছে কুমুদবন বৃষ্টির প্রহারে,
ডুবে গেছে কমলের ফুল,
জর্জ্জরিত হয়েছে নীলশালুক,

কোথায় বসবে—ভেবে না পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত উড়ে বেড়াচ্ছে ভ্রমরের বলয়।

অচ্ছোদকে দেখে চন্দ্রাপীড়ের দ্বিগুণ বেড়ে গেল দুঃখ।
এমন শ্রীহীন রূপ আগে কখনো দেখেনি চন্দ্রাপীড়।

প্রসিদ্ধ মরালেরা ছেড়ে চলে গেছে জল ;

যে চক্রবাকেরা পদ্মপাতার আড়ালে যুগলে যুগলে বিহার করে বেড়াত তারা উচ্চকিত হয়ে আজ উড়ে বেড়াচ্ছে—গৃহহারা;

অর্দ্ধমগ্ন তরুর শাখার শিখরে শিখরে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে সিক্তপক্ষ বক বলাক—অনেক রকমের পাখী।

তীরদেশে উপনীত হয়ে তুরঙ্গবাহিনীকে আদেশ দিল চন্দ্রাপীড়—

"আমাদের দেখে বৈশম্পায়ন লজ্জায় অন্য কোথায়ও চলে যেতে পারে ; তোমরা ঘেরাও করে ফেল অচ্ছোদের চারদিক্।"

ইন্দ্রায়ুধপৃষ্ঠে চন্দ্রাপীড় খুঁজতে লাগল বৈশম্পায়নকে—লতাগহন থেকে বৃক্ষতলে, বৃক্ষতল থেকে শিলাতলে, শিলাতল থেকে বর্ষার গুল্মজর্জর মণ্ডপে। কিন্তু সন্ধান মিলল না বৈশম্পায়নের; কোথাও যে সে ছিল, পাওয়া গেলনা এমন কোন চিহ্নও।

"তবে কি পত্রলেখার কাছ থেকে আমার আসার সংবাদ পেয়ে আগেই সে সরে পড়েছে ? না, এমন কোনো নিরুদ্ধ-প্রদেশে লুকিয়েছে যে প্রদেশের দেখা-মিললেও দেখা-মিলবেনা বৈশম্পায়নের ? এ কী বিপদে পড়া গেল ! বৈশম্পায়নকে না দেখে এখান থেকে এক পাও নড়তে চাইছেনা আমার পা।

অথচ আমার সমস্ত প্রাণটাকে দূর হেমকূট অলক্ষ্য-শৃঙ্খল দিয়ে টানছে। দেরী সইছে না। শেষে কি বৈশম্পায়নেরও দেখা পাব না, কাদম্বরীরও না।”

হতাশ হয়ে পড়ল চন্দ্রাপীড়।

কিন্তু আশার আছে একটি স্বভাব—তার রং বদলায় না; শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকে। চন্দ্রাপীড়ের হঠাৎ মনে হল—“আর্য্যা মহাশ্বেতার কাছে একবার সন্ধান নিলে হয়। হয়ত বৈশম্পায়নের কথা তিনি কিছু জানলেও জানতে পারেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করি। তারপর; পরের কথা পরে।”

কার্য্যপদ্ধতি স্থির হতেই আশ্রমের অনতিদূরে তুরঙ্গ-সৈন্যদের সন্নিবেশিত করে সৈন্যসজ্জা ত্যাগ করল চন্দ্রাপীড়। মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, সর্পনির্ম্মোকের মত পরিলঘু—পরিধান করল বসন। সজ্জিত ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ করে দ্রুত উপস্থিত হল মহাশ্বেতার আশ্রমে।

অশ্বপালকের হস্তে ইন্দ্রায়ুধকে সমর্পণ করে ব্যগ্রচরণে প্রবেশ করল অভ্যন্তরে। ভিতরে প্রবেশ করেই বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে গেল চন্দ্রাপীড়।

একি হয়েছে মহাশ্বেতার!

গুহাদ্বারে শুভ্রশিলাতলে কাকে ধরে রয়েছে তরলিকা!

জল-ছলছল দীনদৃষ্টি: সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে! এ কিসের অসহ্য শোক!

হঠাৎ কোন্ প্রবল ঝড়ে ছিঁড়ে পড়েছে লতা!

কাদম্বরীরও কোন অনিষ্ট ঘটেনি ত? নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, তা না হলে এতদিন পরে আমাকে দেখেও আর্য্যা মহাশ্বেতার শোকের অবসান হয় না কেন?

নিবিড় শঙ্কায় ভিন্ন হতে লাগল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়।

মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে স্খলিত-পদে অভিভূতের মত বসে পড়ল শিলাতলের প্রান্তে। তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

কোন কথা বেরলনা তরলিকার মুখ থেকে। কেবল মহাশ্বেতার মুখের দিকে ফিরে গেল তার দৃষ্টি।

দিলেন মহাশ্বেতা—নিরুদ্ধকণ্ঠে, অশান্ত শোকের আবেগে

"কুমার, কী বলবে আপনাকে বরাকী তরলিকা। হয়ত আপনার মনে পড়ে—একদিন এক হতভাগিনী তার কঠিন হৃদয় নিয়ে আপনাকে শুনিয়েছিল এক মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী। সেই আমি—আপনাকে আজ শোনাতে চাই আর এক মর্ম্মবিদার গাথা। কুমার, এ কী চলেছে আমার জীবন নিয়ে ছেলেখেলা! লজ্জায় ঘৃণায় অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে নিজের জীবনে। তবু বাঁচিয়ে রাখতেই হবে এই দেহটাকে। উপায় নেই। শুনুন।

কেয়ূরক যখন ফিরে এসে খবর দিলে আপনি চলে গেছেন উজ্জয়িনীতে তখন ভেঙে পড়েছিল আমার মন। আমার হৃদয়ের মধ্যে যে একটি গোপন উদ্দেশ্য মুখ লুকিয়ে ছিল তার অসম্ভাবিত সাফল্যে অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছিলুম। তারপর অকস্মাৎ সেই সাফল্যের নিদারুণ ব্যর্থতায় চঞ্চল হয়ে আশ্রমে চলে আসি। মহারাজ চিত্ররথ আমাকে ধরে রাখতে পারেননি, বিফলে গেছে মদিরার প্রার্থনা, ছিন্ন করে এসেছি কাদম্বরীর গাঢ়বন্ধ স্নেহপাশ।

সেদিন আশ্রমে ফিরে এসে ভাবছি—"মিলনবিরহের মধ্যে আর থাকব না। ধ্যানধারণা তপস্যায় জীবনটা দেব কাটিয়ে"—

এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, একটি ব্রাহ্মণকুমার—অনেকটা আপনারই মতন তাঁর আকৃতি—আশ্রমের চারদিকে কি যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—যেন কিছু হারিয়ে গেছে তাঁর।

উন্মত্তের মত তাঁর চলা, অন্তঃকরণ যেন উধাও, শরীর কেমন লঘু, চোখের দৃষ্টিতে উদাস উদাস ভাব।

আমাকে দেখতে পেয়েই আমার কাছে ছুটে এলেন। তাঁর জগতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই—এস্নিধারা তাঁর চোখের চাহনি।

পূর্ব্বে কখনও দেখিনি কিন্তু তাঁর ভাব দেখে আমার মনে হল তিনি আমাকে বোধ হয় চেনেন। পরিচয় নেই তবু যেন অনেক দিনের রয়েছে পরিচয়; যেন আমার প্রতি তাঁর এসে গেছে একটা প্রৌঢ় প্রণয়।

আমি ত তাঁর হাবভাব দেখে নির্ব্বাক

আমাকে দেখেই তাঁর দীনহীনের মত চেহারায় ফুটে উঠল অপূর্ব্ব আনন্দের আভা। কোনো কথা মুখ ফুটে বললেন না—তবু বেশ বুঝতে পারলুম—

আমাকে কী যেন বলছেন,

কিসের যেন প্রার্থনা, মিনতি,

যেন আমাকে অভিনন্দন দিতে চান সদ্যজাগ্রত এক অপূর্ব্ব স্মৃতি ; অথচ সে উপহারকে বাধা দিচ্ছে ভীতলজ্জা—অপরিচয়ের প্রধান কণ্টক।

স্তব্ধ অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখের তারা দিয়ে অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চাহনি যেন উন্মত্তের, আবিষ্টের। যেন পান করতে চায়, ভিতরে প্রবেশ করতে চায়। কী এক অদ্ভুত আকর্ষণী সেই চাহনির!
তারপরে আমার চোখের উপর থেকে চোখ না তুলে নিয়ে হঠাৎ নির্লজ্জের মত বলে উঠলেন

"বরতনু, এ জগতে দেখতে পাই যারা জন্ম, বয়স কিংবা আকৃতির অনুরূপ ব্যবহার করে চলে তাদের নিন্দা করেনা লোকে। কিন্তু আপনার এ বিসদৃশ আচরণ কেন? অম্লান মালতীফুলের মালার মত ঐ সুকুমার দেহখানি—কণ্ঠের সঙ্গে থাকবে যার নিত্য প্রণয়—সেই মালাখানিকে কি তপস্যার ধূম দিয়ে মলিন করা সাজে? এও কি দেখতে হবে—এমন লতায় নেই রসাশ্রয়ী ফল? জন্ম থেকেই যারা রূপহীন, তারাও প্রথমে ভোগ করে তপস্যার ক্লেশ। যাদের রূপ আছে তারা ত করেই। তাই, আমাকে দুঃখ দিচ্ছে আপনার স্বভাবসরস বরাঙ্গের ব্রতগ্রহণ। এ যে মৃণালিনীকে তুষার দিয়ে ঢাকা।
পৃথিবীর সুখের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে যদি আপনি গ্রহণ করে থাকেন তপস্যাব্রত, তাহলে আমাকে বলতেই হবে বৃথাই ধনুকে জ্যা দিয়েছিলেন পুষ্পশর, বৃথাই চাঁদের উদয়, বৃথাই হয় বসন্তের আবির্ভাব। ঐ যে কুমুদ কুবলয় কহ্লার—কেন ওদের ফুটে ওঠা? সার্থকতা কি জ্যোৎস্নার, লীলানদীর তীরের,

দক্ষিণে বাতাসের ? এত যে বর্ষার ধারাপতন—এরই বা কি কোনো মানে হয় ?”

পুণ্ডরীকের তিরোধানের পর থেকে আমারো মনের পরিবর্ত্তন ঘটে ছিল। পঙ্কিল বলে মনে হতে লাগল ব্রাহ্মণকুমারের কথাগুলি। তিনি কে, কোথা থেকেই বা এসেছেন, কেন অপব্যবহার করছেন বাক্যের—এ সব প্রশ্ন পারলুম না তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে।

চলে এলুম।

দূরে দেবার্চ্চনার ফুল তুলছিল তরলিকা—তাকে ডেকে বল্লুম—

'তরলিকা, ঐ যে দেখছিস্—এক ব্রাহ্মণকুমার দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওকে যেন কেমনধারা ঠেকছে। ওর কথা, ওর চাহনি ভাল নয়। ওকে বলে দে—চলে যেতে। এখানে যেন আর না আসে। আর যদি তোর বারণ না শুনতে চায় তাহলে এই আমি বলে রাখছি—ওর ভাল হবে না, বিপদ ঘটবে।'

তখনকার মত ব্রাহ্মণ-কুমার চলে গেল। কিন্তু যার কপাল পুড়েছে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায় না ; পঞ্চশরের দোষেই বলুন, ভবিতব্যতার নিয়মেই বলুন, সেই ব্রাহ্মণকুমার অনুবন্ধ করতে ছাড়ল না।

সারাদিনে একটিবার করেও অন্ততঃ দেখা দিয়ে যাবে।

এমন-কিছু একটা করে বসবে যাতে প্রকাশ পাবে গাঢ় প্রেমের পরিচয় ; অথচ মুখে রইবে না কথা, ভঙ্গীতে রইবে না ইঙ্গিত।

এম্নি করে কিছুদিন কেটে যায়।

তারপর একদিন—তখন গাঢ় হয়ে এসেছে যামিনী—আমি এই শিলাতলে দেহটিকে এলিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ছিলুম, পাশে ঘুমন্ত তরলিকা। আমার চোখে ঘুম ছিলনা।

পূর্ব্বগগনের একটি কোণে কাঁপতে লাগল আলো। দেখতে দেখতে উঠল চাঁদ।

চাঁদের কিরণ গায়ে লাগতেই শিউরে উঠল আমার গা। এই আগুনেই পুড়েছিল আমার পুণ্ডরীক!

নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে আছি, আর কত কি কথা ভাবছি! ধীরে ধীরে বইতে লাগল অচ্ছোদের সমীরণ,

বর্ণের অমৃতকূর্চ্চ দিয়ে দিগ্বধূদের মুখগুলিকে শুভ্র করে দিলেন চন্দ্রমা, আর আমার মনে পড়তে লাগল পুণ্ডরীকের কথা।

চন্দ্র থেকে যে মহাপুরুষ বেরিয়ে এসেছিলেন—কই—এখনও ত তিনি ফিরিয়ে দিলেন না আমার পুণ্ডরীককে! তবে কি তাঁর কথা মিথ্যা, অলীক, আমাকে ভুলিয়ে রাখার ছল! কপিঞ্জলও নিরুদ্দেশ; এতদিনেও কি তার উচিত ছিল না আমাকে একটা খবর দেওয়া?

এই সব চিন্তা করছিলুম—জাগ্রত কত স্বপ্ন, অনিদ্র কত বিভীষিকা।

এমন সময়ে দেখি—নিভৃতপদসঞ্চারে—সেই ব্রাহ্মণযুবাটি আমার দিকে এগিয়ে এগিয়ে আসছে।

তাকে দেখেই আমার ভয় হতে লাগল।

কেতকীর পরাগে শুভ্র তার অঙ্গ—যেন প্রাণ পেয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে আসছে ভস্মসার মদন।

ভুজাগ্রে কুণ্ডলীকৃত মৃণাল।

কর্ণে—কেতকীর গর্ভপত্রের কম্পিত শোভা; যেন একফালি চাঁদ—মন্মথের প্রথম সহায়,—তর্জ্জনী তুলে বলছে 'কোথায় চলেছ, নিস্তার নেই তোমার।'

ছিঃ ছিঃ, কুমার, তার কথা বলতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তার কি পরলোকের ভয় ছিল না? একেবারে নিলর্জ্জ! এতটুকু ধৈর্য্য নেই! কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বিচার পর্য্যন্ত করল না।

দিনের আলোর মত স্পষ্ট সেই চাঁদের আলোয় আমি দেখতে পেলুম—হঠাৎ বাজে-ধাওয়া ঘুঘুর মত বিকৃত হয়ে গেল তার ভাব।

দূর থেকেই প্রসারিত ভুজযুগে আমাকে আলিঙ্গন করবার অলীক আশা নিয়ে স্খলিতপায়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

গুরু উরুযুগ বারম্বার তাকে বাধা দিতে লাগল, যেন বললে

'পরের হৃদয়টাকে না জেনে তার কাছে ধেয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

কিন্তু বৃথা। যে প্রেমার্ত্ত তার গতিরোধ করা বৃথা।

আমার নিঃস্পৃহ মনে উদ্রেক হল শঙ্কার।

যদি ও এসে আমার গাত্র স্পর্শ করে তাহলে তখনি আমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে।

যে পুণ্ডরীককে পুনর্বার ফিরে পাবার আশায় দুঃখের চিতানলে জ্বলেও এ দেহকে জীবিত করিয়ে রেখেছি, সেই দেহকে কোথাকার কে কোথা থেকে এসে অপবিত্র করে দেবে?

চিন্তার অবকাশ পেলুম না।

হঠাৎ শুনতে পেলুম—

"দেবি, পঞ্চশরের সহায় ঐ চন্দ্রদেব আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আমাকে রক্ষা কর, শরণাগতকে স্থান দাও। প্রতিকার নেই, আমি আর্ত্ত; আমি কাঙাল। তোমার হাতে এই নিজেকে সমর্পণ করে দিলুম। শরণাগতকে, অতিথিকে স্থান দেওয়া তপস্বীদের ধর্ম্ম। যদি আমাকে বরদান না কর—"

আর শুনতে পেলুম না।

সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল ক্রোধ।

চোখ থেকে বেরতে লাগল জ্বলদ্‌জ্বালা।

পায়ের তলা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল গাত্রযষ্টি।

আবিষ্টের মত আত্মহারা হয়ে ক্রোধপরুষকণ্ঠে তাঁকে বললুম,

"আঃ পাপ, এখনও বজ্রঘাত হলনা তোর মাথায়, টুকরো হয়ে খসে পড়ল না জিহ্বা! তোর শরীরে কি স্থান নেই পঞ্চমহাভূতের? বহ্নি—তোকে ভস্মীভূত করলেন না, মরুৎ—তোকে মিলিয়ে দিলেন না, বরুণ—তোকে প্লাবিত

করলেন না, রসাতলে নিলেন না—ক্ষিতি, এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন—আকাশ! পৃথিবীর এই সুন্দর বিধানের মধ্যে কেমন করে জন্ম হল তোর মত কামচারীর? তির্য্যক্‌জাতির মত ব্যবহার! একটা শুকপাখীর মত যেমন তুই তোর মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়ে স্থান বিবেচনা না করে কথা বলে চলেছিস তেমনি তোর জন্ম হল না কেন শুকযোনিতে—যাদের সমস্ত কথাতেই হাসি পায় অথচ রাগে ঘুরে পড়ে না মাথা! আমাকে যেমন তুই দুঃখ দিয়েছিস্ তেমনি এমন তোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চিরদিনের মত তোকে ভুলতে হয় আমাকে—যাতে শুক হয়ে ভুলতে হয় তোকে মানুষকে ভালবাসা।"

এইকথা বলে আমি নভোসুন্দর চন্দ্রমার দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বল্লুম

"ভগবন্, ভুবনচূড়ামণি, আমাকে রক্ষা কর। যদি আমি পুণ্ডরীক ছাড়া আর কোনো পুরুষের কথা মনের নিভৃতে কখনও চিন্তা করে না থাকি তাহলে আমার কথা সত্য হোক্—যেন এই কামচারীর আমার শেষকথার সঙ্গে শুকযোনিতে পতন হয়।" প্রার্থনা শেষ হতেই কিসে জানিনা—প্রেমের অসহ্য আবেগ, না—নিজের দুষ্কৃতির গৌরব, না—আমার প্রার্থনার অব্যর্থতায়, দেখি, সেই ব্রাহ্মণকুমার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ধরণীতে,—প্রচণ্ড ঝড়ে শিকড় ছিঁড়ে উপড়িয়ে পড়েছে যেন বনস্পতি!

বাক্যহারা তরলিকা তার বুকে হাত দিয়ে বললে "সব শেষ হয়ে গেছে।"

ক্ষণপরেই ব্রাহ্মণকুমারের পরিজনেরা কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল।

তাদের মুখে জানলুম, সেই ব্রাহ্মণকুমার আপনার বন্ধু—বৈশম্পায়ন।"

স্তব্ধ হলেন মহাশ্বেতা।

কিন্তু তাঁর লজ্জানতনয়নে রুদ্ধ হল না অশ্রুর ধারা

সিক্ত হল ধরণী।

সমস্ত কথা চন্দ্রাপীড় শুনল।

ক্রমে নিমীলিত হয়ে এল দীর্ঘায়তলোচন!

ভগ্ন হল দৃষ্টি, ভ্রষ্ট হল বচনের সৌষ্ঠব।

বল্লে—

"ভগবতি, আপনার এত যত্ন সত্ত্বেও—ক্ষীণপুণ্য আমার পাওয়া হলনা—এ জন্মের মত—কাদম্বরীর চরণপরিচর্য্যার সুখ। জন্মান্তরে যেন—মিলন হয়—"

এই কথা বলতে বলতে দীর্ণ হয়ে গেল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়—কাদম্বরীকে না পাওয়ার নিদারুণ বেদনায়;

যেমন করে দীর্ণ হয়ে যায় ভেদোন্মুখ মুকুল—ভ্রমরের ছোট্ট একটি আঘাতে।

* * * *

প্রলয় ঘটে গেল।

মহাশ্বেতাকে ছেড়ে দিয়ে ত্রস্তপদে দৌড়ে এসে তরলিকা ধরে ফেললে চন্দ্রাপীড়ের পতনোন্মুখ দেহ। বললে

"ভর্ত্তৃদারিকে, একি হোলো? ভেঙে পড়েছে গ্রীবা। তবে কি প্রাণ নেই? কোটরে প্রবেশ করেছে দুনয়নের তারা। হৃদয় স্তব্ধ। কি হবে আমাদের মণিদিদির?"

বলতে বলতে চীৎকার করে উঠল তরলিকা। তখন·········

অসাড় হয়ে গেছে মহাশ্বেতার শরীর।

চীৎকার শুনে দৌড়ে এল অশ্বপালক।

চন্দ্রাপীড়ের অবস্থা দেখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না; কিন্তু তার বুঝতে বাকি রইল না, কি ঘটেছে। মহাশ্বেতাকে "রাক্ষসী, দুষ্টতাপসী" বলে সম্ভাষণ করতে ছাড়লে না।

আর্ত্তনাদ করে উঠল—বল্লে—"রাক্ষসী, তারাপীড়ের বংশে বাতি দিতে আর কাউকে রাখলি না?"

আর্তনাদ শুনে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধেয়ে এল রাজপুত্রদের দল।

বিফলে গেল প্রাণকে ফিরিয়ে আনবার সমস্ত প্রয়াস।

মুহুর্মুহু চীৎকার করে উঠল ইন্দ্রায়ুধ। চন্দ্রাপীড়ের মুখের দিকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। থর থর করে কেঁপে উঠল বিরাট দেহ। চার পা দিয়ে খুঁড়তে লাগল মাটি। নিজের তুরঙ্গদেহ বিসর্জন দেবার অভিপ্রায়েই যেন সে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল বাগ্‌ডোর। ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল দামামা সোনার শৃঙ্খল।

এদিকে পত্রলেখার সঙ্গে কাদম্বরী তখন আশ্রমের দিকে আসছেন।

"চন্দ্রাপীড় আশ্রমে এসেছেন"—পত্রলেখার কাছে এই খবর পেয়ে গন্ধর্বলোকে কি থাকা যায়? চাঁদ উঠলে সাগরের জল কি সামলাতে পারে বেলাভূমির আকর্ষণী মায়া? "মহাশ্বেতাকে দেখতে যাচ্ছি"—এই কথায় পিতামাতাকে ভুলিয়ে কাদম্বরী তখন পত্রলেখা আর মদলেখাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের দিকে আসছেন।

আসছেন আর রুণ্‌রুণ্ করে বাজছে পদ্মপায়ে পাঁয়জোর; কী কথা কয় যে মেখলার মালা!

সঙ্গে সঙ্গে আসছে মদলেখা—তারও আজ রম্যোজ্জ্বল বেশ, হাতে সুরভিমাল্য, অনুলেপন, পটবাস,—মন্মথের সমস্ত সৈন্যকে বিহ্বল করার উপচার।

পথ দেখিয়ে আসছে কাদম্বরীর বীণাবাদক কেয়ূরক।

পত্রলেখার হাত ধরে কাদম্বরী তখন বলছেন মদলেখাকে—

"মদলেখা, পত্রলেখা প্রত্যহ আমাকে বলে, আমাকে বোঝাতে চায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না—সেই নির্দয় সেই নিষ্ঠুর সেই শঠ—সে কেবল আমার জন্যেই আসছে। তোর কি মনে পড়ে না, মদলেখা, সেদিন—সেই হিমগৃহে—দুর্দ্দশা দেখেও তিনি আমাকে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাতে ছাড়েননি। শেষে তোকে হেসে মৃদুমধুর ছুটোকথা পর্য্যন্ত তাঁকে শোনাতে হয়েছিল। যাই বলিস্ তোরা, সেদিন্ যদি আমি মরেও যেতুম তাহলেও তিনি আমাকে

বিশ্বাস করতেন না। এ কথা আমি বলে রাখছি—সেদিন যদি তাঁর মনে না হত যে "কাদম্বরী আমার জন্যে সামান্য একটু বেদনা পেয়েছে"—তাহলে এখন তিনি কখনই আসতেন না। আজকে কিন্তু মদলেখা, সব কিছু বলার ভার তোর উপরেই রইল। এই আমি বলে রাখছি—আমি তাঁর দিকে ফিরেও তাকাব না, কথাও বলব না, পায়ে পড়লেও অটল হয়ে থাকব। তখন যেন তোরা দয়া করে আমার প্রসাদ ভিক্ষা করিস্‌নি।"

এই কথা বলতে বলতে দূর পথের শ্রম ভুলে দীপের মত উজ্জ্বল হৃদয় নিয়ে কাদম্বরী দেখা করতে এলেন চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে আশ্রমে।

কিন্তু তখন প্রলয় ঘটে গেছে—আশ্রমে।

কাদম্বরী দেখতে পেলেন চন্দ্রাপীড়কে।
সমস্ত পৃথিবী পায়ের নীচে টলে গেল।
প্রলয় ঘটে গেল কাদম্বরীর বিশ্বে।

সমুদ্রকে মন্থন করে কে যেন হরণ করে নিয়ে গেছে অমৃত,
রাত্রির আকাশ থেকে কে যেন লুপ্ত করে দিয়েছে চন্দ্র তারা ;
পদ্মবন থেকে উৎখাত করেছে কর্ণিকা,
টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে দিয়েছে জীবনপদ্মের অঙ্কুর।

চন্দ্রাপীড়কে দেখে কথা বেরল না কাদম্বরীর মুখ থেকে।
মাটিতে পড়ে যেতে যেতে রুদ্ধমানা মদলেখাকে কোনো রকমে ধরে ফেললেন।
অচেতন হয়ে কাদম্বরীর হাত ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল পত্রলেখা।

মূঢ়ের মত স্তব্ধদৃষ্টি, আবিষ্টের মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন কাদম্বরী।
নিশ্বাস যেন পড়েনা—ভুল হয়ে গেছে।
মুখের রঙ—শ্যামারুণ—যেন পূর্ণিমার গ্রহণলাগা চাঁদ।

কে যেন কুঠার দিয়ে আঘাত করেছে লতাকে—মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে লতা—কাঁপছে কেবল অধরকিশলয়।

স্বভাবতঃ মেয়েদের যা হয় না, তাই হল কাদম্বরীর।

কণ্ঠে রুদ্ধ হল রোদন, অসহ্য শোকের দাহে শুকিয়ে গেল অশ্রু।

দশা দেখে পায়ে পড়ে কেঁদে উঠল মদলেখা।

"অমন করে নিজেকে চেপে রাখিসনে। অনিষ্ট ঘটবে। বিপদ বাড়াসনি। খানিকটা কেঁদে হাল্কা করে ফেল নিজেকে—নয়ত—ভেঙে পড়বে হৃদয়। তুই না থাকলে দুটো বংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি খবর দি দেবী মদিরা আর মহারাজ চিত্ররথকে।"

মদলেখার কথা শুনে কাদম্বরীর ঠোঁটের কোণে খেলে গেলো হাসির ইঙ্গিত। বললেন

"তুই কি পাগল হলি, উন্মত্তিকে? বজ্রের মত কঠিন আমার হৃদয়—এতই সহজে কি চূরমার হয়ে ভেঙে যাবে? এত দেখেও ত এখনও লক্ষ টুক্‌রো হয়ে ফেটে পড়ল না! সে যে কাদম্বরীর সব ছিল—তার বাপ, মা, তার বন্ধু, আত্মা, সখী, পরিজন!"

তারপরে ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন

"প্রিয়তমের শরীরটি কোনো রকমে পেয়েছি; যদি বেঁচে ওঠে তাহলে—মিলনে, যদি না বাঁচে তাহলে—অনুমরণে, যেমন করেই হোক্ শান্ত করব আমার সমস্ত দুঃখের জ্বালা।

মদলেখা, তুই আমাকে অমন করে বলিসনি। আমার জন্যেই এসে, আমার জন্যেই জীবন উৎসর্গ করে, যে লোক আমার আত্মাকে কোথায় উঠিয়ে দিয়ে গেছে কোন্ মহত্ত্বের শিখরে—সেখান থেকে কি চোখের জল ফেলে সেই আত্মাকে লঘু করে মাটিতে ফিরিয়ে আনতে পারি? আমরা যে একই লোকের পথিক। তুই বলিস্ কি, চোখের জল ফেলে সে যাত্রায় ঘটাব অমঙ্গল? যে মানুষ পায়ের ধূলোর মত তাঁর পায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে জন্মেছে তার কি কখনও শোভা পায় এই আনন্দের সময় কাঁদা?

এতে দুঃখেরই বা কি রয়েছে? দূর হয়ে গেছে সমস্ত দুঃখ? এখন আবার কাঁদব কেন? যার জন্যে কুলের কথা ভাবিনি, গুরুজনদের ভুলেছি, ডরাইনি অপবাদকে, লজ্জা ছেড়েছি,—সখীরা উপচার নিয়ে এলে তাদের ঠেলে দিয়েছি, মহাশ্বেতাকে কাঁদিয়েছি, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে এতটুকুও কিন্তু করিনি—সেই যখন চলে গেল, তখন বল্ মদলেখা বল্, আমি কেমন করে বেঁচে থাকি? এ কী তুই বলছিস্? এখন মরাই হচ্ছে বাঁচা, বেঁচে থাকাই হচ্ছে মরণ।

যদি আমাকে সত্যিকারের ভালবাসিস তাহলে মদলেখা, এইটুকু শুধু দেখিস আমার শোকে যেন প্রাণ না হারান মহারাজ আর মা। যেন তোতেই মেটে তাঁদের মনের আশা। এই বলে গেলুম, তোর ছেলে হলে সে যেন আমাকে এক অঞ্জলি জল দেয়। আর এমন করে চলিস্, যাতে আমার সখীরা, আমার পরিজনেরা আমার অভাব বোধ না করে; যাতে তারা আমাকে ভুলে যায়—যেন আমার ঘরখানিকে শূন্য দেখে তারা না চলে যায় যে যার পথে।"

ক্ষণিক বাধা পড়ল কাদম্বরীর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাসে; তিনি বললেন

"আমার ঘরের আঙিনায় যে সহকার-শিশুটিকে ছেলের মত করে মানুষ করেছি, মদলেখা, আমার হয়ে তুই তার সঙ্গে মাধবীলতার বিয়ে দিস্।

আমার অশোক গাছের পাতা কেউ যেন না ছিঁড়ে নেয়, কেউ যেন না তার পাতা দিয়ে গড়ে কর্ণপূর।

দেবতার মাথায় ছাড়া আর কারো মাথায় যেন না পড়ে আমার মালতীলতার ফুল।

আর দেখিস্—কামদেবের যে একটা ছবি আছে আমার ঘরে—মাথার দিকে—সেটাকে ফেলে দিস্—টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিস্।

কালিন্দী আর শুক পরিহাসকে আকাশে দিস্ উড়িয়ে, তারা মুক্তি পাবে। আর যে মরালটা আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকত নিশিদিন তার এমন একটা কিছু ব্যবস্থা করিস্ যাতে না কেউ তাকে মেরে ফেলে।

আর তুমি নিও আমার অঙ্কপ্রণয়িনী বীণা।

পদ্মপাতার আস্তরণে, চন্দনের স্নিগ্ধতায়, অকঠোর মৃণালের উপাধানে মাথা

রেখে, অমৃতকিরণে ফুটন্ত নীলপদ্মের পালঙ্কে শয়ন করে অনেকদিন কাটিয়েছি অনেক রাত,—তাতেও জ্বলেছে আমার দেহ। সেই দগ্ধশেষ দেহটাকে এবার প্রিয়জনের কণ্ঠলগ্ন করে উজ্জ্বল চিতায় করব নির্বাণ।"

স্তব্ধ হলেন কাদম্বরী।

কিন্তু সখী মদলেখার মুখে ফুটে উঠল নিশ্চল নিশ্চয়তা।

সেই নিশ্চয়তা যেন নিজের ভাবকে গোপন না করেই বলে উঠল—"আমারও পণ রইল। যদি তুমি অনিষ্ট ঘটাও, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসর্গ করব প্রাণ।"

মদলেখার সে নিশ্চয়তাকে অগ্রাহ্য করে মহাশ্বেতার কণ্ঠ জড়িয়ে—মুখে বিকার নেই—কাদম্বরী বললেন

"প্রিয়সই, তোর তবুও আশা রয়েছে। সেই আশাই জ্বালিয়ে রেখেছে তোর মিলনের স্বপ্নদীপকে, তারই করুণায় তুই সহ্য করতে পেরেছিস মৃত্যুর অধিক দুঃখ;

সেই আশাই তোর এই বেঁচে থাকবার ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি লজ্জাকে, উপহাসকে, নিন্দাকে।

কিন্তু আমার যে কিছু নেই।

আমাকে বিদায় দে, জন্মান্তরে আবার তোর সঙ্গে যেন মিলন হয়।"

এই কথা বলে কাদম্বরী নিজের কোলের উপর তুলে নিলেন চন্দ্রাপীড়ের দুখানি চরণ।

স্বেদামৃতে আর্দ্র হল কর।

প্রথম স্পর্শ! চন্দ্রাপীড়কে এই প্রথম স্পর্শ। একি প্রথম মিলনের আনন্দসুখ!

চরণদুটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন কাদম্বরী;

পূজার ফুলের মত পায়ের উপর ঝরে পড়ল করবী-খসা অভিসারমঞ্জরী।

প্রথম পরশ!

কাদম্বরী তাঁর সমস্ত দেহে, শিরায় শিরায়, রোমে রোমে, অনুভব করলেন স্পর্শের নিবিড়তম সুখ।

সে কী অসহ্য সুখ! সে সুখ ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে দিল বিরহ, ভুলিয়ে দিল বিশ্ব।

কাদম্বরীকে দেখে তখন মনে হল—অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের

তিনি যেন একটি মিলনধ্যানরতা কুমুদিনী—

রোমাঞ্চ-কুঙ্কুমে উদ্ভাসিত,

অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে স্বেদমকরন্দের বিন্দু,

আঁখি-কুমুদ মুকুলের মত বদ্ধ,

আনন্দাশ্রুর ঢেউএ তপ্তশ্বাসের সমীরে সারা অঙ্গ কাঁপছে।

কাদম্বরীর স্পর্শেই যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের দেহ। সেই দেহ থেকে সমস্ত প্রদেশকে তুহিনময় করে দিয়ে হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এল চন্দ্রধবল কী একটি অব্যক্তরূপ জ্যোতিঃ; এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরীক্ষে জাগল অমৃত-ক্ষরণ-করা অশরীরিণী এক বাণী—

"মহাশ্বেতা, পুনর্ব্বার আশ্বাস দিচ্ছি। আমার লোকে আমার তেজেই অবিনাশী হয়ে শায়িত রয়েছে পুণ্ডরীকের শরীর। তোমাদের মিলন হবেই।

এই যে চন্দ্রাপীড়ের শরীর—এও আমারি তেজে পূর্ণ—অবিনাশী, বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শে আপ্যায়িত হয়ে অবিনাশী হয়ে রয়েছে। দেহান্তরসংক্রান্তী মুক্তশাপ যোগীদের দেহের মত শাপান্ত পর্য্যন্ত এইখানেই তোমাদের প্রত্যয়ের জন্য থাকবে। অগ্নি দিয়ে এর সংস্কার কোরো না, সলিলে একে নিক্ষেপ কোরো না, একে পরিত্যাগ করে চলে যেওনা। যতদিন না মিলন ঘটে ততদিন এই দেহটির যত্ন নিও।"

বাণীর আকস্মিকতায় সকলে, সমস্ত পরিজন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে চিত্রলিখিতের মত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। নিষ্পলক দৃষ্টি।

কেবল চেয়ে রইল না পত্রলেখা।

সেই জ্যোতিঃপদার্থের তুষার-শীতল স্পর্শে মূর্চ্ছা থেকে জেগে উঠেই আবিষ্টের মত ছুটে গেল ইন্দ্রায়ুধের নিকটে। পরিবন্ধকের হাত থেকে ইন্দ্রায়ুধকে ছিনিয়ে নিয়ে একবার শুধু বললে

"আমার মত লোকের যা হবার তা হবে; কিন্তু তুই কেমন করে রয়েছিস্? একলা তোর প্রভু বিনাবাহনে দূর দেশে চলে গেল—আর তুই এখনও রয়েছিস দাঁড়িয়ে!"

তারপরেই ইন্দ্রায়ুধকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অচ্ছোদ সরোবরের অতল জলে।

দেখতে দেখতে ঘটে গেল এক অদ্ভুত ব্যাপার!

সরোবরের জলতল ভেদ করে সহসা জেগে উঠল আবির্ভাবের মত একটি তাপস-কুমার।

শিরে তার কৃষ্ণবর্ণ মলিন জটার স্তূপ; সেই জটা দীর্ঘশিখায় ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর—যেন রাশীকৃত শৈবাল থেকে ঝরে পড়ছে জল;

পুণ্যদেহে মৃণালতন্তুর মত ব্রহ্মসূত্রের দীপ্তি;

কটিদেশে জীর্ণমন্দারের বল্কল,—পরিম্লান নীলপদ্মের পাপড়ির মত পাণ্ডুর।

মুখ থেকে জটাগুলিকে হাত দিয়ে সরাতে সরাতে সহসা জেগে উঠল অচ্ছোদের জলতল ভেদ করে এক তাপসকুমার—তাম্র তার চক্ষু, উদ্বিগ্ন তার আকৃতি।

অশ্রুজলের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে মহাশ্বেতা দেখতে পেলেন, সেই তাপসকুমার তাঁরই দিকে এগিয়ে এগিয়ে আসছে।

ক্ষণপরেই শুনতে পেলেন—শোকগদ্‌গদ্ এক কণ্ঠ—

"গন্ধর্বরাজপুত্রি, জন্মান্তর থেকে আমি ফিরে এসেছি, আমাকে কি চিনতে পারছেন?"

কণ্ঠস্বরই প্রত্যক্ষ করে দিল পরিচয়কে।

একদিকে বিষাদ, আর একদিকে হর্ষ,—সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়ালেন মহাশ্বেতা। পদবন্দনা করে উত্তর দিলেন—

"ভগবন্ কপিঞ্জল,—আমি কী এমন পুণ্য করেছি যে আপনাকে চিনতে

পারব ? নিজেকে নিজেই এখনও চিনতে পারিনি। এ রকমের সন্দেহ আপনার হওয়াই সম্ভব—কারণ আমি এতই অকৃতজ্ঞ যে দেব পুণ্ডরীক নেই অথচ আমি রয়েছি বেঁচে।

আমাকে বলুন—প্রভুকে যে নিয়ে গেল সে কে? কেনই বা নিয়ে গেল, কী ঘটল তাঁর, এখন তিনি কোথায়? জলের মধ্য থেকে কেমন করেই বা হল আপনার আবির্ভাব, এতদিন আমাকে কোনো খবরই বা দেন নি কেন? কোথা থেকেই বা এলেন দেবতাকে ফেলে রেখে?"

কপিঞ্জলকে ঘিরে ফেলেছিল চন্দ্রাপীড়ের অনুগামীদের দল, রাজপুত্রলোক, কাদম্বরীর পরিজন; বিস্ময়ে অবাক্ অথচ উৎগ্রীব।

তাদের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে মহাশ্বেতাকে বললেন কপিঞ্জল

"গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি, শুনুন। সেদিনের কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণ আছে। প্রলাপিনী আপনাকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে বয়স্যের ভালবাসায় পাগল হয়ে "কোথায় চলেছিস্ প্রিয়সুহৃদ্‌কে চুরি করে" এই কথা বলতে বলতে আকাশে উঠে পড়ি এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পিছু পিছু।

তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়েই গীর্ব্বাণপথে দ্রুত উঠে যেতে লাগলেন। আমাদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল বিস্ময়োৎফুল্ল বৈমানিকদের লক্ষ লক্ষ চক্ষু, মুখে গুণ্ঠন টেনে পথ ছেড়ে দিতে লাগল দিব্যলোকের অভিসারিকাদের দল, প্রণাম করতে লাগল আলোল-তারকেক্ষণা তারাবধূদের সমারোহ। আকাশ-সরোবরের বিকচকুমুদের মত তারাগণকে অতিক্রম করে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ শেষে প্রবেশ করলেন চন্দ্রিকাভিরাম এক চন্দ্রলোকে। সেইখানে এক সভায়—মহোদয় তার নাম—ইন্দুকান্তমণির বিরাট পর্য্যঙ্কে পুণ্ডরীকের দেহটিকে স্থাপন করে আমাকে বললেন

"কপিঞ্জল, জেনো, আমি চন্দ্রমা। সেদিন রজনীতে আমি ব্যাপৃত ছিলুম জগতের কল্যাণ-কার্য্যে। আমার কোনো অপরাধ ছিল না। তোমার এই কামাপরাধী প্রিয়বয়স্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে দিতে আমাকে এই বলে অভিশাপ দেয়

'দগ্ধ চাঁদ, তুই নিষ্ঠুর, তোর আত্মা, তোর প্রাণ বলে কিছুই নেই। তোর কিরণ দিয়েই যেমন আমার ভালবাসাকে জাগিয়ে—প্রেয়সীর মিলননিরাশ আমাকে—হত্যা করতে এতটুকুও দ্বিধা করলিনি, তেম্‌নি তোরও মৃত্যু ঘটবে—কর্ম্মভূমিভূত এই ভারতবর্ষে জন্ম জন্ম তুই জন্মাবি—প্রেমে পাগল হবি—তারপরে মিলন না হওয়ার অসহ্যবেদনায় আমার চেয়েও তীব্রতর দুঃখ পেয়ে জীবন দিবি বিসর্জ্জন।'

শাপনলের দুরন্তদাহে জ্বলে উঠে চন্দ্রলোক থেকে আমি বাহির হয়ে আসি। নিজে অপরাধ করে মূঢ়ের মত আমাকে দিয়ে গেল শেষে অভিশাপ! ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে জ্বলে উঠল।

প্রতিশাপ দিলুম—'তুইও আমারি সমান দুঃখদুখ পাবি।'

তারপর যখন ধীরে ধীরে শান্ত হল ক্রোধ, ফিরে এল বিবেক, তখন হঠাৎ আমার চেতনা হল। একি করেছি? একি বিপদে ফেললুম মহাশ্বেতাকে। মহাশ্বেতা যে আমার মেয়ের মত। আমারি কিরণজাত অপ্সরাদের কুলে যে তার জন্ম। গৌরী যে তার মা! মহাশ্বেতা স্বয়ং পুণ্ডরীককে স্বামীত্বে বরণ করেছিল!

চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিঁধতে লাগল এই নিষ্ঠুর সত্য যে, নিজের অপরাধে অপরাধী হয়ে আমারই সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকে তাকে জন্ম জন্ম জন্মাতে হবে। শেষে জন্মজন্মের অভিসম্পাতকে আমি দুজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিই। তা না হলে জন্ম জন্ম—এই বীপ্সার কোনো সার্থকতা থাকে না। যতদিন না পুণ্ডরীক শাপমুক্ত হয় ততদিন তার আত্মাবিরহিত দেহটিকে অবিনাশী করে রাখতেই হবে—এই চিন্তা করে আমি তাকে চন্দ্রলোকে নিয়ে এসেছি।

কপিঞ্জল, তুমি ত শুনেইছ আমি আশ্বাস দিয়েছি মহাশ্বেতাকে। এখন আমার তেজঃ দিয়ে পরিচর্চ্চা করে শাপান্ত পর্য্যন্ত রেখে দেব পুণ্ডরীকের দেহটিকে এইখানে। মহামুনি শ্বেতকেতুর নিকট গমন করে নিবেদন কর বৃত্তান্ত। হয়ত তিনি তাঁর শক্তিবলে এর কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিহিত করতে পারেন।"

চন্দ্রদেব আমাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু আমি তখন শোকে একেবারে উন্মাদ!

ছুটে চলতে লাগলুম আকাশপথে। কি যে করছি, তার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

ফলে এই হল—অন্ধের মত আমি লঙ্ঘন করে গেলুম মহাক্রোধী এক বৈমানিককে।

ক্রোধে জ্বলে উঠে ভ্রূকুটিকরাল দৃষ্টিতে আমাকে যেন দগ্ধ করে তিনি বললেন

"দুরাত্মা, মিথ্যা তপোবলের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে চলেছিস। এত বিস্তীর্ণ নভোরাজ্যে খুঁজে পেলিনি পথ? উদ্দামচারী তুরঙ্গের মত যেমন আমাকে লঙ্ঘন করে চলেছিস, তেমনি তুই—তুরঙ্গের মূর্ত্তি নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে যা।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একি করে ফেলেছি!

সিক্ত হল আঁখিপর্ণ অশ্রুতে। অঞ্জলি রচনা করে তাঁকে বললুম

"বয়স্যের শোকে অন্ধ হয়ে অনাচার করে ফেলেছি, অবজ্ঞায় নয়। ক্ষমা করুন। প্রসন্ন হোন। প্রত্যাহার করুন আপনার অভিশাপ।"

ক্ষণমৌনতার অবসানে আমাকে তিনি বললেন—

"আমার বাণীর অন্যথা হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত হতে পারে—যার তুমি বাহন হবে তার দেহান্তে যদি স্নান করতে পার তাহলে শাপমুক্ত হবে।"

নিবেদন করে বল্লুম—

"ভগবন্, তাই যদি হয় তাহলে একটী মিনতি আমার রাখুন;—চন্দ্রশপ্ত আমার প্রিয়বয়স্য পুণ্ডরীক শাপগ্রস্ত চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নেবে মর্ত্ত্যলোকে। দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখে এইমাত্র আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তুরঙ্গম হয়েও প্রিয়বয়স্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অবিয়োগে থাকতে পারি।"

আমার প্রার্থনা শুনে তিনি ধ্যান করলেন মুহূর্ত্তকাল। তারপরে বললেন

"তোমার ভালবাসার মাধুর্য্যে হৃদয় আমার গলেছে। দিব্যচক্ষু দিয়ে আমি দেখেছি। উজ্জয়িনীর অধিপতি তারাপীড় পুত্রকামনা করে তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। চন্দ্রদেব স্বমূর্ত্তিতেই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

তোমার বয়স্য পুণ্ডরীক মন্ত্রী শুকনাসের হবে তনয়। এবং তুমি হবে সেই মহোপকারী চন্দ্রাত্মা-রাজপুত্রের তুরঙ্গবাহন।”

বৈমানিকের বাক্যশান্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার পতন হয়। দিব্যলোক থেকে আমার পতন হল মহাসমুদ্রের বিশালতায়। ফেনিল তরঙ্গ থেকে যখন নির্গত হয়ে এলুম তখন দেখি আমার দেহ ধারণ করেছে তুরঙ্গের রূপ।

কিন্তু রাজপুত্রি, তুরঙ্গম হলে হবে কি? লুপ্ত হলনা আমার জ্ঞান বা বোধশক্তি। সেই বোধশক্তির কৃপাতেই, হয়ত বা এই অভিসম্পাতের প্রলয় থেকে উদ্ধার পাবার অভিপ্রায়েই, আমি সেদিন ছুটিয়ে এনেছিলুম চন্দ্রাপীড়কে কিন্নরমিথুনের পিছু পিছু। সেই চন্দ্রাপীড়—ভগবান চন্দ্রমার অবতার।

আর যিনি প্রাক্তন অনুরাগের বিলীয়মান স্মৃতির পরাধীন হয়ে এই অচ্ছোদ সরোবরের তীরে, নিকুঞ্জে, লতামণ্ডপে, আশ্রমে আবিষ্টের মত ফিরেছিলেন নিশিদিন আপনাকে কামনা ক'রে, অনুভব করে তীব্র বেদনায় জ্বালা, যাকে আপনি কিছু না জেনে শুনেই দগ্ধ করেছিলেন অভিশাপের বহ্নিতে, তিনিই বৈশম্পায়ন, তিনিই আমার প্রিয়বয়স্য পুণ্ডরীকের অবতার।”

এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ গুহাবিদারী স্রোতের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মহাশ্বেতার হৃদয়ে।

কেঁদে উঠলেন মহাশ্বেতা।

একি করেছি! যিনি জন্মান্তরেও ভুলে যাননি মহাশ্বেতার ভালবাসা, যিনি জীবনটাকে ধরে রেখেছিলেন তাকেই-পাবার-অভিলাষে, যিনি তারই মুখ-চাওয়া, তার সর্ব্বস্ব, পূর্ণ করে রয়েছেন তার ব্রহ্মাণ্ড—এ কি করেছি তাঁর?

আমি কি রাক্ষসী হয়ে জন্মেছি লোকান্তরেও তাঁকে বিনাশ করবার সঙ্কল্প নিয়ে? দগ্ধবিধাতা আমাকে কি এই জন্যেই গড়েছিলেন, আয়ুঃ দিয়ে ছিলেন? আমাকে দিয়েই, যে আমার হৃদয়ের হৃদয়, তাকেই বার বার করালেন হত্যা?

নিজে বধ করে সে পাপের দোষ কাকেই বা দেওয়া যায়? কাকেই বা বলা যায়? কার কাছেই বা ভিক্ষা চাওয়া যায়—দয়া?

মহাশ্বেতার লজ্জা হল এত পাপের পর ভিক্ষা চাইতে।

নিশ্চয় এতদিনে আমার উপর তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। কেঁদে পড়লেও হয়ত দেবেন না, কথার ছোট্ট একটি উত্তর।

জীবনের উপর ধিক্কারে, বৈরাগ্যে, ঘৃণায়—বুকে কর হানতে হানতে লুটিয়ে পড়লেন মহাশ্বেতা ধরণীতে।

আর্ত্তপ্রলাপিনী মহাশ্বেতাকে অনুকম্পার অমৃতরসে সিক্ত করে দিতে দিতে কপিঞ্জল তখন বললে

"দেবি! না, না, অমন কথা বলবেন না। আপনার ত কোনো দোষ নেই। অনিন্দ্যনীয় আপনি কেন নিজের উপরে নিচ্ছেন অহেতুক নিন্দা।

এবার ত দুঃখের অবসান হল, এবার আসছে আনন্দের দিন। নিজের দেহের উপর অপ্রসন্ন হওয়া—বৃথা। যেটা অসহ্যতর ছিল—মিলনের প্রত্যাশা তাকে অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে। জন্ম জন্ম ধরে এই যে আপনাদের দুঃখভোগ চলেছে এত কেবল অভিসম্পাতের নির্লজ্জ অনুগ্রহেই। আপনিও শুনেছেন চন্দ্রমার ভারতী। সেই হেতুই আপনাকে বলছি মন থেকে মুছে ফেলে দিন অশ্রেয়স্কর শোকানুবন্ধ—উভয়ের মঙ্গলের জন্যে ব্রত গ্রহণ করে তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকুন। অসাধ্য কিছু নেই একনিষ্ঠ তপস্যার। তপস্যার শক্তিতেই একদিন গৌরী লাভ করেছিলেন স্মরারির অর্দ্ধদেহ। আপনিও দেখবেন নিজের তপোবলেই অচিরেই আমার বয়স্যকে লাভ করবেন—স্বামিরূপে।"

সান্ত্বনাবাণী শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষণ্ণদীনমুখী কাদম্বরী জিজ্ঞাসা করলেন কপিঞ্জলকে

"ভগবন্ কপিঞ্জল, আপনি এবং পত্রলেখা দুজনেই ত একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন অচ্ছোদের জলে। পত্রলেখার কি হল?"

কপিঞ্জল বললে

"রাজপুত্রি, সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়বার পর পত্রলেখার যে কী হল তা আমার জানা নেই।

এখন বিদায় দিন আমাকে। চন্দ্রাত্মক চন্দ্রাপীড়ের, পুণ্ডরীকাত্মক বৈশম্পায়নের কোথায় বা জন্ম হল, পত্রলেখারই বা কি ঘটেছে—সমস্ত বৃত্তান্ত জানবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাকে যেতে হবে ত্রিলোকদর্শী তাত শ্বেতকেতুর পদমূলে।"

এই কথা বলতে বলতে অন্তরীক্ষপথে উধাও হয়ে গেল কপিঞ্জল।

আকস্মিক কপিঞ্জলের আবির্ভাব!—আকস্মিক তার অন্তর্ধান! এ রকমের আকস্মিকতা নিভিয়ে দেয় সুতীব্রশোকের বহ্নিকে।

তাই হল সকলের।

শেষে পরিজনেরা রাজপুত্রলোকেরা ধীরে ধীরে নিজের নিজের স্থানে সরে সরে বসল। চন্দ্রাপীড়কে ছাখে—আর চোখের জলের উৎস যেন খুলে যায়।

এমন সময় তারা শুনতে পেল—কাদম্বরী মহাশ্বেতাকে বলছেন

"প্রিয়সখি, বিধাতা তোকে আর আমাকে সমান দুঃখ দিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আজ আমি মাথা তুলতে পারছি। তোকে মুখ দেখাতে—আমার লজ্জা হচ্ছে না—বাধ-বাধ ঠেকছে না তোর সঙ্গে কথা কইতে। এতদিনে সত্যিই তোর প্রিয়সখী হলুম। মরণ বাঁচন দুইই—সমান।

তোকে ছাড়া আর কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? এখন আমাকে কি করতে হবে বল্? কি ভাল, কি মন্দ, বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

মহাশ্বেতা কাদম্বরীকে বলছেন

"প্রিয়সই, কিই বা তোর প্রশ্ন, কিই বা দেব উপদেশ? মিলনের আশা—তোকে দিয়ে যা করিয়ে নেবে, তাই করতে হবে তোকে। কপিঞ্জল যখন প্রভুর কথা বল্লেন তখন তাঁর মুখের কথাতেই আমাকে সান্ত্বনা পেতে হয়েছিল; আর তোর কোলে ত পা রেখে শুয়ে রয়েছেন চন্দ্রাপীড়—বিশ্বাসের পরিপূর্ণ আধার। করবি আর কি? যাতে এ দেহের ক্ষয় না হয় তাই করতে হবে। যে সব দেবতারা চোখের দেখার বাইরে থাকেন, তাঁদেরই পূজার জন্যে গড়তে হয় মাটি পাথর কিম্বা কাঠের প্রতিমা।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন কাদম্বরী

চন্দ্রাপীড়ের সুকুমার দেহখানিকে তরলিকা, মদলেখা আর কাদম্বরী অন্য একটি শিলাতলে শুইয়ে দিলেন সন্তর্পণে—যে শিলাকে স্পর্শ করতে পারবেনা শীতের বাতাস, বর্ষার জল, গ্রীষ্মের দাহ।

তারপরে কাদম্বরী খুলে ফেললেন অঙ্গ থেকে শৃঙ্গারবেশ, একটি একটি করে সমস্ত আভরণ; কেবল রইল—চন্দ্রাপীড়ের কল্যাণকল্পে একটি হাতে একখানি রত্নের বলয়।

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পরিধান করলেন ধৌতশুচি দুকূল;
অধরকিসলয় থেকে ধুয়ে ফেললেন গাঢ়লগ্ন তাম্বুলের রক্তিমা।
গলিত না হয়ে চোখের সীমার মধ্যে টল্ টল্ করতে লাগল অশ্রু।
সমস্ত কেমন যেন ওলটপালট করে দিয়েছে।
এক নিমেষে সমস্তই যেন ঘটে গেল—

ভাবনার ছিল যা বাইরে,
যা হতে পারে বলে জানা ছিলনা,
যা পূর্ব্বে-কখনও হয়নি,
যা অশিক্ষিত, যা অনভ্যস্ত, যা অনুচিত।

যে ফুলগুলিকে চয়ন করে নিয়ে এসেছিলেন অভিসারে আসবার সময়, নিয়ে এসেছিলেন যে গন্ধধূপ, যে চন্দন, যে অনুলেপন, সেইগুলি দিয়ে কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের চরণপ্রান্তে সাজালেন দেবপূজার অর্ঘ্যনৈবেদ্য।

পূজা করল চন্দ্রাপীড়কে—মূর্ত্তিমতী এক শোকবৃত্তি।

অনাহারে কেটে গেল সেই ভয়ঙ্কর দিন। এ দিনের যেন শেষ নেই। দূরাগমনখিন্ন বুভুক্ষিত রাজপুত্রলোক, কাদম্বরীর পরিজন, তাদেরও সেইদিন কেটে গেল অনাহারে স্নানহীন।

বেলা যতই পড়ে আসতে লাগল ততই রূপান্তরিত হতে লাগল কাদম্বরীর আকৃতি;

আরও উদাস হয়ে যেতে লাগল তাঁর মুখশ্রী,
তাতে কেমন যেন ভীত আর্ত্ত ভাব,
যেন হৃদয়কে মথিত করে জমাট বেঁধে উঠেছে মরণের অধিক দুঃখ।

চোখ থেকে যাতে অমঙ্গল-আনা জল না পড়ে, তার জন্য অশ্রুরোধের কী নিদারুণ প্রয়াস!

রাত্রি এল। কৃষ্ণপক্ষের শশিহীন যামিনী।
মেঘের অবরোধে আকাশে নেই একটিও তারা।
হৃদয়বক্ষকে কাঁপিয়ে দিয়ে অবিরত উঠতে থাকে মেঘের রূঢ় গর্জ্জন।
কলাপীর আকুল-করা কেকায়, দর্দ্দুরের অত্যুগ্র গান্ধারে, দুর্দ্দর্শ বিদ্যুতের নির্হ্রাদে, শঙ্কায় শিউরে ওঠে দশটা দিক্। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক ভীষণতার মধ্যেও মেয়েদের সহজাত ভীতিকে দূর করে দিয়ে কাদম্বরী রইলেন বসে—অঙ্কে তাঁর চন্দ্রাপীড়ের চরণকমল—স্পর্শে যার নৈশজাগরণ হল মধুর, লুপ্ত হল শারীরিক অবসাদ, গাছের তলায় তলায় জোনাবিজ্বলা নিবিড় অন্ধকারের প্রসারতাও হল কমনীয়।

তারপরে যখন সকাল হল, আকাশের বর্ণ হয়ে এল নীলকপোতের কণ্ঠরোমের মত ক্ষীণশ্যাম—তখন চন্দ্রাপীড়ের শরীরের দিকে দৃষ্টি ফেলেই দেখতে পেলেন কাদম্বরী—টাট্‌কা রং দিয়ে আঁকা একখানি ছবির মত শুয়ে রয়েছে তাঁর চন্দ্রাপীড়।
চোখকে বিশ্বাস করা যায় না।
ধীরে ধীরে হাত দিয়ে—পাশেই ছিল মদলেখা—তাকে ঠেলে উঠিয়ে বললেন

"মদলেখা, এদিকে একবার চেয়ে দেখত। আমি যা দেখছি তাতে ত কিছু বুঝতে পারছিনা। দেহের কি কোনো বিকার হয়নি, না, আমার অনুরাগ, রুচি দিয়ে আমি দেখছি? আমি ত আগেকার মতই দেখছি সব। তুই একবার ভাল করে দেখ্।"
মদলেখা বল্লে

"প্রিয়সখি, দেখবার কি রয়েছে? আত্মা নেই, তাই কেবল স্পন্দনহারা কুমারের দেহ। তা ছাড়া আর সবই ত একই রকম রয়েছে।

ফোটা পদ্মের মত তেমনি রয়েছে মুখ, সৌন্দর্য্যে ঢলঢল;

কপালের উপর ঐ যে চুলগুলি বাঁকা বাঁকা ডগা নিয়ে এলিয়ে পড়েছে, দেখ, সেগুলি কেমন রয়েছে চিক্কণ ;

কপালখানাও দেখ—যেন লুটিয়ে পড়েছে আধফালি জ্যোতির্ম্ময় চাঁদ ;

হাসির কোনো চেষ্টা নেই—তবুও ঠোঁটের কোণদুটিতে, গালের নীচে কেমন টোল খেয়ে উঠেছে হাসির আভাস।

বিশ্বাস না হবার রয়েছে কি ?

নীলপদ্মকে হারিয়ে-দেওয়া তেমনি দুটি চোখ,

কচি কিসলয়ের মত তেম্নি অধরের রঙ্,

হাতপায়ের নখ থেকে, আঙুলগুলোর তলা থেকে তেমনি ফেটে পড়ছে বিদ্রুমের মত লালিত্য।

একেই বলে সহজলাবণ্যে-সুকুমার শ্রীঅঙ্গের সৌষ্ঠব।

আমার ত মনে হয় আকাশবাণী মিথ্যা নয়, অনেক কিছু রয়েছে কপিঞ্জলের অভিশাপের কাহিনীতে।"

আনন্দের নির্ভরতায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন কাদম্বরী।

সত্য, একি তবে সব সত্য ? এ জিনিষ মহাশ্বেতাকে না দেখিয়ে কেমন করে থাকা যায় ?

ডাক দিলেন মহাশ্বেতাকে।

চোখে টল্‌টল্ করছে অশ্রু,—মহাশ্বেতাকে দেখালেন তাঁর চন্দ্রাপীড়ের মূর্ত্তি।

রাজপুত্রলোকও বাদ পড়ল না।

তারা ছুটে এল। একি আনন্দের সংবাদ! অথচ বিস্ময়ভরা রয়েছে রহস্য।

বড় বড় চোখ দিয়ে তারা নিষ্পলক ক্ষণকাল দেখল, তারপরে লুটিয়ে পড়ল শ্রীচরণে তাদের শির।

অঞ্জলি রচনা করে নতজানু হয়ে তারা কাদম্বরীকে বল্লে

"হীনপুণ্য আমাদের ত্যাগ করে দূরে চলে গেছেন কুমার। তাঁর মুখে ঐ যে চন্দ্রমণ্ডলের মত প্রসন্নদ্যুতি—ও কেবল আপনার শক্তিতেই

সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্বের মতই—আমরা তাঁর চরণযুগলে দেখতে পাচ্ছি ফুল্ল তামরসের কান্তি, ওঁর হৃদয়টিকেও দেখে মনে হচ্ছে—যেন আপনার প্রসাদ পাবার প্রত্যাশায় বিভোর হয়ে রয়েছে। তাই যদি না হবে, তাহলে মানুষের রাজত্বে আমরা যা দেখলুম, শুনলুম, অনুভব করলুম, তাও কি কখনও সম্ভব হয়!'

কাদম্বরী তখন সখীদের পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে উঠলেন।

স্নান করে দেবার্চ্চনার ফুল তুলে এনে ধীরে ধীরে করলেন চন্দ্রাপীড়ের শরীরপূজা।

রাজলোককে আদেশ দিলেন—শরীর সংস্কার করতে।

ফলমূল নিয়ে এলেন মহাশ্বেতা—গ্রহণ করলেন একত্রে।

চন্দ্রাপীড়ের চরণদুটিকে কোলে রেখে কাটিয়ে দিলেন দিন।

পরদিন সকালে কাদম্বরী পুনর্বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলেন চন্দ্রাপীড়ের দেহ। শরীরের অবিনাশিত্ব-সম্বন্ধে যখন দৃঢ় হল তাঁর ধারণা তখন মদলেখাকে ডেকে আদেশ দিলেন

"মদলেখা, শাপান্ত পর্য্যন্ত প্রভুর শরীরের পরিচর্চ্চা করব। আমাকে এখানে থাকতে হবে। তুমি হেমকূটে ফিরে গিয়ে মহারাজ মহারাণীকে নিবেদন কর এই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত। কিন্তু দেখো, তাঁরা যেন অন্য কিছু ভেবে নিয়ে আমার জন্য ব্যথা না পান। আর একটি কাজ করিস,—আমার মত অভাগিনীকে তাঁরা যেন না দেখতে আসেন। তাঁদের দেখে আমি চেপে রাখতে পারব না আমার চোখের জল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রভুর দেহত্যাগের পরেও আমি কাঁদিনি,—দেখিস, যখন আশা একটু ফিরেছে তখন আমাকে যেন ফেলতে না হয় চোখের জল।"

কয়েকদিন বাদে হেমকূট থেকে মদলেখা ফিরে এসে বল্লে

"প্রিয়সখি, সিদ্ধ হয়েছে তোমার বাসনা। তোমাকে গাঢ় গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে, বারবার তোমার মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁরা বলতে বলেছেন—

"কাদম্বরী, আমরা ভেবেছিলুম—জামাতার সঙ্গে তোকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের বুঝি হবে না। শুনে অত্যন্ত সুখী হলুম যে নিজে বরণ করে নিয়েছিস স্বামীকে। তারপরে যখন শুনলুম যে তোর স্বামী—লোকপাল ভগবান চন্দ্রমার অবতার, তখন আমাদের আনন্দের অবধি রইল না। শাপ শেষ হলে যখন যুগলে আসবি তখন তোর মুখখানিকে যেন দেখতে পাই—আনন্দাশ্রুতে ঝলমল্ পদ্মের মত।"

সেই দিন থেকে কাদম্বরীর দিন কাটতে লাগল—অশ্রুমুখী, চন্দ্রাপীড়ের শরীরের পরিচর্য্যায়, দেবতার মত করে তাঁকে নিত্য আরাধনায়।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল বর্ষার মেঘেমেদুর দিনগুলি। মেঘের কারাগার থেকে মুক্তি পেল জীবলোক।
দিগন্ত ফিরে পেল তার প্রসারতা,
গ্রামের নগরের সীমান্তে ঢেউ দিয়ে উঠল ধান্যমঞ্জরীর সোনার রঙ, রমণীয় হল পাদপের ছায়া।
কাশের ফুলে ফুলে শাদা হয়ে এল বনের সবুজ,
পল্বলে পল্বলে শিউরে উঠল কহ্লার,
কুমুদের সৌরভে শীতল হল যামিনী,
রাত্রিশেষের হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল শেফালিকার সুবাস।
তীরের সৈকতরেখাকে তরঙ্গিত করে ধীরে ধীরে সরে গেল বর্ষার জলধারা।
ক্রমে পঙ্কহীন নাতিশুষ্ক অরণ্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে, গ্রামপথের অকঠোর কর্দ্দমের উপর চিহ্ন রেখে, রূঢ় তৃণদলের মধ্যে নবপথের সৃষ্টি করে বেরিয়ে পড়ল কত রাজার দিগ্বিজয়ের বাহিনী।

এম্নি এক শরৎকালের স্বচ্ছ দিনে চন্দ্রাপীড়ের চরণপ্রান্তে বসে রয়েছেন কাদম্বরী, মেঘনাদ নিকটে এসে বললে

"উজ্জয়িনী থেকে কতকগুলি বার্ত্তাহর এসেছে। মহারাজ তারাপীড়

মহাদেবী বিলাসবতী, আর্য্য শুকনাস যুবরাজের বিলম্বে অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছেন।'

দুর্ঘটনার কথাটুকু বাদ দিয়ে আর যা যা ঘটেছে সমস্তই তাদের জানিয়ে আমরা বল্লুম 'তোমাদের মুখ দিয়ে দেব চন্দ্রাপীড়ের পাঠাবার-মত কোনো খবর নেই। দেবী কাদম্বরীরও না। তোমরা বিলম্ব না করে লোকার্ত্তিহর দেবদেব মহারাজ তারাপীড়ের চরণপ্রান্তে সুসংবাদ নিবেদন কর।'

আমাদের কথা শুনে তারা ক্রুদ্ধ অভিমানভরে বল্লে

'আপনাদের কথা সবই বুঝলুম। আমাদেরও বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে কুমারের সঙ্গে। যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তার উপর আমরা সুদূর উজ্জয়িনী থেকে এসেছি। কী এমন অপরাধ করেছি—কী এমন মহাপাপ—যে তাঁর দর্শন না পেয়েই আমাদের বিদায় নিতে হবে! এ প্রসাদ ত আমরা চিরকালই তাঁর কাছে পেয়ে এসেছি। কি হল আজ আমাদের যুবরাজের, যে তাঁর চরণবন্দনাও আমাদের কাছে দুর্লভ। আমরা ত তাঁর চরণলগ্ন পদধূলি। যাতে দেব ও দেবীর চরণদর্শন হয় তারি ব্যবস্থা করুন। আর এও কি কখনও সম্ভব! এতদূরে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ফিরে এসেছি—একথাই বা দেবদেব তারাপীড়ের সম্মুখে নিবেদন করব কোন্ মুখে?

এখন দেবী যা আদেশ করেন।"

শ্বশুরকুলে যে কী বৈক্লব্য ঘটেছে—কী বলে যে তাদের আশ্বাস দেওয়া যায় ভেবেই পেলেন না কাদম্বরী।

নয়নদুটি অন্তরের সমস্ত বেদনাকে যেন পান করেই টল্‌টল্ করতে লাগল। বাণীর রূঢ় অস্পষ্টতা চেপে ধরল তাঁর কণ্ঠ।

শেষে কোনরকমে কাদম্বরী বললেন

"ওরা যে যাবেনা বলে পণ করেছে—ঠিকই করেছে। কুমারকে না দেখে ফিরে গিয়ে ওরা কী বলবে! ঘটনা যা ঘটেছে তা এত সৃষ্টিছাড়া যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না; না দেখেই বা ওরা বিশ্বাস করে কি ক'রে?

মেঘনাদ, আমাদের কাছে জীবনের এখনও মূল্য রয়েছে, নিজের জীবনকে এখনও বড় ভালবাসি, ছল করে দেখিয়েছি মাত্র ভালবাসার দুএকটি পল্লব।—সেই আমরাই যদি দেখতে পারি, তাহলে ওরাই বা দেখবে না কেন—যারা প্রভুর ভালবাসায় একেবারে অন্ধ, জীবনের এতটুকুও মায়া যারা রাখেনা !

ওদের নিয়ে এস, দেখে যাক্ ওদের দেবতাকে, পথশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোকেও সফল করে ওরা যাক্।"

মেঘনাদ প্রবেশ করালো বার্ত্তাহরদের। তাদের বুক ভেসে গেল জলে। মাটিতে পঞ্চাঙ্গ স্পর্শ করে তারা প্রণাম করল চন্দ্রাপীড়কে। নিশ্চল, উৎপক্ষ্ম দৃষ্টি।

কাদম্বরী তাদের বললেন

"যে দুঃখের শেষ-কোথায় বিচার করে পাওয়া যায় না, যে দুঃখের দুঃখেতেই হয় পর্য্যবসান, সেই দুঃখই, যাদের মৃত্যুভয় রয়েছে, তাদের বিপন্ন করে, ডুবিয়ে দেয় শোকের সমুদ্রে। কিন্তু যে দুঃখের পরিণামে রয়েছে সুখ, সুখের প্রত্যাশার মাত্র রয়েছে ব্যবধান—সে দুঃখ হৃদয়কে তত বাজে না। প্রভুকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেছে সে ঘটনায় শোকের যে কেবলমাত্র নিরবকাশতা নেই তা নয়, এতে রয়ে গেছে বিস্ময়ের অবসর।

এ তোমাদের বোঝাব কেমন করে ? অন্য কোথাও হয়নি,—মানুষের রাজত্বেই এটার সম্ভব হল।

তোমরা ত নিজেরাই দেখছ—অক্ষত অবিকৃত রয়েছে কুমারের দেহ, তাঁর মুখ। কথা-বলবার আভাসও পাওয়া গেছে।

তোমরা ফিরে যাও উজ্জয়িনীতে। সংবাদের জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন মহারাজ। শুধু এইটুকু কোরো, মৃতদেহের অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের কিছু বোলোনা। শুধু বোলো—কুমারকে আমরা দেখেছি, অচ্ছোদ সরোবরের তীরে তিনি আছেন।

যদি কেউ বলে 'মৃত্যু ঘটেছে'—সে কথা অনায়াসে বিশ্বাস করে লোকে ;—কিন্তু যদি কেউ বলে "প্রাণ নেই, অথচ ধ্বংস হয়নি শরীর"—একথা চোখে

দেখলেও লোকে অশ্রদ্ধা করবে। ও কথা বলে, সুদূর উজ্জয়িনীতে তাঁরা আছেন – গুরুজনদের—মরণসংশয়ে ফেলোনা। প্রাণ ফিরে এলেই কুমারই সমস্ত পরিষ্কার করে দেবেন।"

কিন্তু বার্ত্তাহরেরা বললে

"দেবি, কি বলব আপনাকে ?

দুটি উপায়ে এই ব্যাপারকে আমরা গোপন করতে পারি। উজ্জয়িনীতে ফিরে না গিয়ে, বা কোনো কথা না বলে। কিন্তু আমাদের হাতে দুটির একটিও নেই। আমরা প্রবাসে থাকায় অনভ্যস্ত। মহারাজ তারাপীড়, মহাদেবী বিলাসবতী, অমাত্যদেব আর্য্য শুকনাস-কস্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক বিবেচনা করে আমাদের পাঠিয়েছেন। ফিরে না যাওয়া আমাদের স্বপ্নেরও বাইরে। দ্বিতীয়তঃ ফিরে গিয়ে তাঁদের চোখের জল দেখে নির্ব্বাকার মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

বার্ত্তাহরদের কথা শুনে "এই ব্যাপার" এই অর্থটিকে যেন প্রকাশ করে দিয়েই কাদম্বরীর পড়ল এক হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস।

শেষে মেঘনাদকে বল্লেন—

"মেঘনাদ, দেখছি—এদের কাছে অনুচিত বলে মনে হয়েছে আমার অনুরোধ। গুরুজনদের কস্ট লাঘব করবার উদ্দেশ্যেই এদের অনুরোধ করেছিলুম। এতে আরও দুঃখ আনবে। প্রচণ্ড এক বাজপড়ার মত লাগবে এর নিদারুণ আঘাত। তখন তাঁদের কি হবে ? যাক্, যা হবার তা হবে।

এখন – এদের সঙ্গে এমন একজন কাউকে পাঠিয়ে দাও – যে সমস্ত ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছে, যার কথার গুরুত্ব আছে, যার মুখের কথায় জন্মাতে পারে বিশ্বাস।"

আদেশ মাথায় করে নিয়ে মেঘনাদ বললে

"দেবি, রাজলোকের কথা ছেড়ে দিন। সামান্য পরিজনেরা কন্দমূল আর ফল খেয়ে দাঁতে কুটি দিয়ে বসে আছে, তাদের মধ্যে একজনও দেব চন্দ্রাপীড়কে

ছেড়ে দিয়ে যাবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, ভৃত্য বটে এরা। এত ভক্তি কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়েনা!

বিপদের সময় যারা সেবাবিমুখ হয়না তারাই ত ভৃত্য। ভৃত্য বলব তাদের—যারা ধনদৌলতের চেয়ে স্নেহকে বড় বলে মেনে নেয়, প্রভুর চরণ-পরিচর্য্যাতেই যাদের তৃপ্তি, পূজাই যাদের সন্তোষ, গুণের প্রশংসাতেই যাদের বাচালতা, প্রভুকে পরিত্যাগ না করাতেই যাদের কার্পণ্য।

তবু, দেবী যখন কুমারের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন তখন আশা করি আপনার আদেশমত একজন কাউকে পাঠাতে বাধা ঘটবেনা।"

বেরিয়ে গেল মেঘনাদ।

কুমারের বালসেবক ত্বরিতককে আহ্বান করে বার্ত্তাহরদের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে দিল পাঠিয়ে।

অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে; কোনো খবর নেই চন্দ্রাপীড়ের; মায়ের প্রাণ স্থির থাকতে পারে না। তাই উতলা হৃদয় নিয়ে সেদিন দেবী বিলাসবতী চলেছিলেন অবন্তীমাতৃকার আয়তনে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে প্রার্থনা করতে;

এমন সময় সহসা দেখতে পেলেন—পরিজনেরা সসম্ভ্রমে দৌড়িয়ে ছুটে গেল;—কানে শুনতে পেলেন "রাণীমা, আজ বড় শুভদিন, অবন্তীমাতৃকারা প্রসন্ন হয়েছেন। যুবরাজের বার্ত্তাহরেরা ঐ এল বলে।"

সুখবর কানে আসামাত্রই আকুলিবিকুলি হয়ে উঠল মায়ের মন। নীলপদ্মের মত বড় বড় চোখ থেকে ঝরে পড়ল অশ্রু। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—যেমন করে হরিণী খোঁজে তার হারাণো শিশুকে। সেই নীলপদ্মের মালার মত দীর্ঘদৃষ্টি—বাষ্পজলে লুলিত—যেন মুহূর্ত্তের জন্য করে পূজা গেল দিক্‌দেবতাদের।

সাধারণ একটা মেয়ের মত চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন মহারাণী।

"কেরে—কথার ছলনায় আমার উপর বৃষ্টি করে গেলি অমৃত?
কার এত দয়া হল—আমার উপর?

কোথায় তারা, কতদূরে রয়েছে ?
কি বললে তারা ? ভাল আছে ত আমার কুমার ?"

উজ্জয়িনীতে তখন সাড়া পড়ে গেছে "ওরা এসেছে।"
রাজপথ দিয়ে দলে দলে চলেছে জনতা। ভেদ নেই রাজায় প্রজায়, ওঠে তাদের লক্ষরকমের প্রশ্ন।

"যুবরাজকে কতদূর পিছনে ফেলে এলি ?
এতদিন তোরা ছিলি কোথায় ?
আচ্ছা বল্‌ত, গিয়ে তোরা কি দেখ্‌লি ?"

একদল জিজ্ঞাসা করছে

"ঘোড়ার পিঠেই চলে গেলেন—বর্ষায় কুমারের বড় কষ্ট হয়েছে—না হে ?"

আর একদল বলছে

"তোর যেমন কথা—অমন ঘোড়াকে কি বর্ষায় রুখে রাখতে পারে ? আরে বাবা, তর্কে কাজ কি—ঐ ত ত্বরিতক আসছে—ওকে জিজ্ঞেস করলেই সব বেরবে।"

অন্যদল বলছে

"সবই ত বুঝলুম। বলি, যে জন্যে যুবরাজের এত কষ্ট তোলা—তার কি হলো ? ফিরে এসেছেন কি আমাদের বৈশম্পায়ন ? সেদিন পত্রলেখার সঙ্গে মেঘনাদ গেলো, তাদের কি দেখা হয়েছে যুবরাজের সঙ্গে ?"

একজন বলছে

"দেববর্দ্ধন কি কিছু বলে পাঠিয়েছে ? না, না, আমার বন্ধু দেববর্দ্ধন ?"

দ্বিতীয়—"বলধর্ম্মার কথা জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। উঃ কি তার দুঃসাহস!"

তৃতীয়—"ও ঘোড়সোয়ার মশাই, বলি, আমার মাতুল ঐ তোমাদের ঘোড়সোয়ারদের কর্ত্তা, পৃথুবর্ম্মা, তাঁর কিছু খবর দিতে পার ?"

চতুর্থ—"অবাক্ করেছেন আমাদের পিতাঠাকুর, আপনার হাতে একটা চিহ্নও পাঠিয়ে দেননি ?"

পঞ্চম—"আমার ছেলে—যুবরাজের ভক্ত—কুমারবর্ম্মা—ভাল আছে ত? ভাল থাকলেই ভাল।"

ষষ্ঠ—"ঐ যে কি নাম—আমাদের অবন্তিসেন—ঐ যে যুবরাজকে রাগিয়ে দিয়ে এই নাচনটা নাচালে—বলি, তার অবস্থাটা এখন কেমন হ্যা।"

দলান্তরের মুখে অন্য কথা।

"ওহে বলতে পার—রাজকুলে কে এবার প্রসাদ পেয়েছে, কার মান এবার বাড়ল। এত দিনে কার কিই বা লাভ হল? বাড়বারই ত কথা। হবেই ত। নতুন নতুন পার্শ্বচর না হলে রাজারাজড়াদেরই বা চলে কি করে?"

"ওসব কথা এখন রাখ। যদি কেউ দেখে থাক ত বলত আমাকে—সর্ব্বসেনের ছেলে বীরসেনের খবরটা। বাপও মরল আর সেই কিনা এবারকার যাত্রায় নামও লেখালে প্রথম? মা বেচারীর যা কষ্ট?... কেমন করে যে বেঁচে আছে তাই ভাবি।"

শতজিহ্ব প্রশ্ন ও জনতার কোলাহলের ভিতর দিয়ে উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করল ত্বরিতককে সঙ্গে নিয়ে লেখহারকের দল;

প্রশ্নের উত্তর-দানে তারা মৌন,
নাসাগ্রে লগ্ন তাদের দৈন্যগর্ভ দৃষ্টি;
প্রবাসের যেন আবাস, সর্ব্বদুঃখের যেন সন্দর্ভ।

মাতৃগৃহের অঙ্গন থেকে তাদের দেখতে পেয়ে দেবী বিলাসবতী আদেশ দিলেন—"ওদের ডেকে নিয়ে এস।"

মহারাণীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গেল লেখহারকদের দুঃখ।

তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কর্ম্মহীন যেন ইন্দ্রিয়গ্রাম। কাষ্ঠ মূর্ত্তি।

শেষে স্খলিতপদে বাষ্পান্ধদৃষ্টি নিয়ে নির্জীবের মত মহারাণীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

মহারাণীকে প্রণাম করতে হয়—একথা তাদের স্মরণেও এল না।
তাদের জিজ্ঞাসা করলেন দেবী বিলাসবতী—

"কুমারকে ত তোরা দেখেছিস? আমার মন যেন আর এক কথা কইছে। বিশ্বাস হয় না। তোরা দেখেছিস ত আমার বাছাকে?"

লেখহারকদের চোখে হঠাৎ উথলে উঠল অশ্রু। প্রণামের ছলনায় চোখের জল গোপন করে মাথা নীচু করে তারা বল্লে—

"দেবী, অচ্ছোদসরোবরের তীরে যুবরাজকে আমরা দেখেছি। তার পরের কথা ত্বরিতক বলবে।"

উদ্বাষ্পমুখী দেবীর মুখ থেকে শুধু বেরল—

"এর পর আর কি বলবে? সব বলা শেষ হয়ে গেছে।—দূর থেকে যখন দেখলুম তোমাদের পা-ফেলায় নেই আনন্দ, মাথায় করে যে প্রতিলেখ নিয়ে এস তাতে জড়ানো নেই মালা, চোখ দুটো চাইছে ছল করে জলকে-পড়তে না-দেওয়া, তখনই তোমাদের সব বলা শেষ হয়ে গেছে, সব। না, না, ভাবিসনি, আমি—কাঁদব না।" অবন্তীমাতৃকার অঙ্গনে প্রলাপ বকতে বকতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মহারাণী বিলাসবতী।

মহারাজের নিকট দৌড়ে চলে এল সহস্র সহস্র পরিজন।

মহারাণী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন—সংবাদ পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ তারাপীড়। উদ্বেল হয়ে উঠল মহাসমুদ্র—মন্দর-পর্ব্বতের তাড়নায়।

আর্য্য শুকনাসকে সঙ্গে নিয়ে বেগবতী এক করেণুকার পৃষ্ঠে আরোহণ করে, উজ্জয়িনীর গোপুর অট্টালক প্রাকার ভবন তোরণ ইত্যাদিকে পিছনে রেখে, বেগে যেন রাজমার্গকে পান করতে করতে, জনতার মুখর জল্পনার মধ্য দিয়ে অবন্তীমাতৃকার আয়তনে নিমেষের মধ্যে উপস্থিত হলেন তারাপীড়।

করেণুকা থেকে অবতরণ করেই দেখতে পেলেন স্তব্ধ হয়ে দীনমুখে বসে রয়েছেন দেবী বিলাসবতী—বৈশাখের পদ্মের যেন রৌদ্র-দগ্ধা ছায়া। তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে দেবীর।

কেউ তাঁর দেহে ছিটিয়ে দিচ্ছে চন্দনের জল,

কদলীর দল দিয়ে কেউ করছে বাতাস,

জল নিয়ে কেউ করছে সংবাহন।

দেবীর পার্শ্বে উপবেশন করে ললাটে, চক্ষে, বক্ষে, কপোলে, বাহুতে স্পর্শামৃতবর্ষী নিজের হাতখানিকে বুলাতে বুলাতে মহারাজ তারাপীড় বললেন

"দেবি, যদি সত্যই অন্য কিছু ঘটে থাকে চন্দ্রাপীড়ের তাহলে আমরা বাঁচতে পারি না।

কি হবে নিজের আত্মাকে ক্লিষ্ট করে সাধারণ বেদনায়? দীর্ঘ জীবনে যে সমস্ত কাজ করেছি তারা শুভ ছাড়া অশুভ কিছুত বহন করে আনে নি। তুমি কি চাও, ভাব, অনন্ত কাল ধরে সুখ ভোগ করে চলব আমরা? আকাঙ্ক্ষা করলেই সব আশা পূর্ণ হয় না, হৃদয়কে খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করলেও হয় না।

আমি জানি—বিধাতা বলে একটা কিছু রয়েছে, তাঁর খুসীতেই চলে ব্রহ্মাণ্ড। তিনি কারোও অধীন নন। এই জীবনে পরাধীন থেকেও যা দুষ্প্রাপ্য সবই ত আমরা পেয়েছি; ভেবেছিলুম যা পাওয়া যাবে না, শেষ জীবনে তাও তো পেয়েছি। দেখেছি চন্দ্রাপীড়ের অতিদুর্লভ জন্মোৎসব, কোলে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি তার কচি মুখ, তার পা দুটিতে চুম্বন দিয়ে রেখেছি তাকে মাথায়। তার পর সে শিখলো হামা দিতে, ধূলো-মাখা তার ছোট্ট অঙ্গটিকে কোলে তুলে সুখ পেয়েছি ধূলো-মাখার। কানে শুনেছি আধআধ ভাষায় তার প্রথম কথা-কওয়া। তার পর সে বড় হল, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক সৌন্দর্য্যে এল শক্তি, এল যৌবন। যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় আঘ্রাণ করেছি তার শির। দিগ্বিজয় থেকে ফিরে এসে যখন প্রণাম করে দাঁড়াল, তখন হৃদয় জুড়িয়েছি তাকে বুকে নিয়ে।"

তারপরে ক্ষণকাল মহারাজ তারাপীড় স্তব্ধ থেকে বাষ্পভারক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন

"দেবি, এইটুকুই বাকি রয়ে গেছে—বধূসমেত চন্দ্রাপীড়কে সিংহাসনে বসিয়ে আমাদের অরণ্যবাস। কি হবে সাধারণ মানুষের মত বেদনায় চঞ্চল হয়ে? কি যে ঘটেছে এখনো পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা গেল না কারো মুখে! ভুল হতে পারে ত পরিজনদের কথা। লেখহারককে পাঠিয়ে ছিলুম; তার সঙ্গে এসেছে

চন্দ্রাপীড়ের বালসেবক ত্বরিতক। সেই জানে সমস্ত বৃত্তান্ত। তুমি এখনও তাকেই কিছু জিজ্ঞাসা করনি। তাকে জিজ্ঞাসা করে তারপরে স্থির কোরো—জীবন মরণের মধ্যে কোনটি বরণীয়।”

মহারাজ তারাপীড়ের ইঙ্গিত—প্রতিহারীদের কাছে আদেশ। বিলম্ব হলনা এক মুহূর্ত্তও। দূর থেকে প্রণাম করতে করতে মহারাজের সম্মুখে জানু নত করে দাঁড়াল ত্বরিতক।

চন্দ্রাপীড়ের কাছ থেকে এসেছে—তার উপর কেমন যেন স্নেহ পড়ে গেল মহারাজের। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আদেশ দিলেন “ত্বরিতক, মহাদেবীর, আমার এবং শুকনাসের লিখিত আদেশ পেয়েও চন্দ্রাপীড় যে কেন এল না আমাদের বলো। উত্তরে কিছু লিখে জানালেও ত সে পারতো।”

রাজাদিষ্ট হয়ে নতমস্তকে ত্বরিতক নিবেদন করে গেল যা ঘটেছে।

‘দীর্ণ হয়ে গেছে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়’ এই পর্য্যন্ত যখন ত্বরিতক বলেছে, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না মহারাজ তারাপীড়। মথিত সমুদ্রের মত আলোড়িত হল তাঁর হৃদয়।

কর প্রসারিত করে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, “ত্বরিতক, আর প্রয়োজন নেই, শান্ত হও যা বলবার তা বলেছ, যা শোনবার তা শুনেছি। পূর্ণ আমার প্রশ্নদোহদ।”

ক্ষণপরে উপস্থিত পরিজনদের চমকিত করে দিয়ে হাস্যবিমিশ্রিতস্বরে বললেন “মিটল আমার শ্রবণের কৌতুক, ধন্য হল কান। আনন্দে আর প্রীতিতে কেমন দেখ নেচে নেচে উঠছে আমার হৃদয়। কি সুখেই রয়েছি।”

ঝড়-খাওয়া দীপের মত অকস্মাৎ নির্ব্বাণ পেল মহারাজের মুখের অস্বাভাবিক হাসি। বললেন “চন্দ্রাপীড় একলাই সহ্য করল বেদনা? এত ভালবাসত বৈশম্পায়নকে? আমরাই কেবল রয়ে গেলুম পৃথিবীতে—কর্ম্মের বোঝা নিয়ে, নির্ব্বিকার হয়ে সহ্য করতে অসহ্য দুঃখের জ্বালা! কি কর্ম্ম-চণ্ডাল আমরা।”

তারপর হঠাৎ মহারাণীর দিকে ফিরে বললেন “দেবি, তোমার আর আমার হৃদয়

বজ্রসারের চেয়েও কঠিন, এখনো লক্ষ টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল না। এত এদের মৃত্যুভয় যে প্রাণগুলো পর্য্যন্ত সঙ্গ নিল না চন্দ্রাপীড়ের! ওঠ, চল, বেশী দূর তাকে এগোতে দেওয়া হবে না।" হঠাৎ উন্মত্তের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মহারাজ।

'শুকনাস, এখনো রয়েছ দাঁড়িয়ে! স্নেহ দেখাবার এই ত সময়। ওদের বলে দাও মহাকালের মন্দিরের কাছে চিতা সাজাক্। মাথা হেঁট করে তোরা কি দাঁড়িয়ে দেখছিস! দূর করে দাও কঞ্চুকিগুলোকে, চোখ দিয়ে জল ফেলছেন! রাজকোষ খুলে দাও। বিলিয়ে দাও যা আছে।"

তারপর অমাত্য শুকনাসের বামস্কন্ধে নিজের দক্ষিণ হস্তখানি স্থাপিত করে বললেন "শুকনাস দেখো, যে যার রাজ্যে যেন সুখে ফিরে যেতে পারে রাজারা। আর দেখো, এ দুঃখের খবর আজ যেন প্রজারা না জানতে পায়। এই বিরাট পৃথিবীতে চন্দ্রাপীড় শুধু একটা—নাম। কাকে দিয়ে যাবো আমার এই—মুকুট।"

আর্ত্তপ্রলাপের ক্ষোভে, আত্মপীড়ায় জর্জ্জর, অভিভূত হয়ে পড়লেন মহারাজ। বিলাসবতী তাঁকে ধরে ফেললেন।

এমন সময় দীনকণ্ঠে নিবেদন করল ত্বরিতক "মহারাজ, যুবরাজ নিষ্প্রাণ বটে, কিন্তু তাঁর শরীর রয়েছে অক্ষয়, অম্লান।"

ত্বরিতকের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন মহারাজ তারাপীড়।

পক্ষ্ম-পাত বিস্মৃত হল চক্ষু,
অবর্ণ্য কৌতুকে দূর হয়ে গেল শোকাবেগ।

কান পেতে বসে রইলেন মহারাজ।

বলে যেতে লাগল ত্বরিতক—যেমনটি দেখেছে, যেমনটি শুনেছে, যেমনটি করেছে অনুভব। গোপন করল না কিছুই।

মহারাজ শুনলেন। ত্বরিতক যে সব অভিজ্ঞান দেখালে তাতে মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল ঘটনা। আবার তখনি মনে জাগল সন্দেহ, ঘটনা বিস্ময়ের

উপর অশ্রদ্ধা। শেষে নিস্তব্ধ শুকনাসের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ল বিমর্শস্তিমিত-তাঁর দৃষ্টি।•

মহারাজের মতই অবস্থা হয়েছিল শুকনাসের। কিন্তু যাঁরা যথার্থ বন্ধু, বন্ধুর দুঃখ দূর করবার জন্য কঠিনতম আত্মদুঃখকেও তাঁরা অপ্রকাশ রাখতে চেষ্টা করেন। নিজের কিছুই যেন হয়নি—এমনি একটি সুস্থ সবল ভাব মুখের উপর ফুটিয়ে তুলে ধীরে ধীরে বললেন শুকনাস

"দেব, এই বিচিত্র সংসারে দেবতা অসুর পশু পাখী আর মানুষেরা দুঃখ আর সুখে বিজড়িত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যারা থাকে, যারা নাশ পায়, যাদের বৃত্তি অনিয়ত—এমন সব স্থাবর জঙ্গমদের মধ্যে এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা অসম্ভব। এর কারণ যে কি তা বলা কঠিন। হয়ত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিকৃতির ফলে কিছু সম্ভব হয়, হয়ত বা পরমাণু-দিয়ে-গড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু ঘটে, হয়ত বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন শুভাশুভ কর্ম্মের বিপাকও এর একটি হেতু। অনেক সময় দেখা গেছে আপনা হতেই অনেক কিছু ঘটে যায়। এ জিনিষ নিয়ে তর্ক করা মিছে, এ যুক্তি তর্কের বাইরে। সেখানে একমাত্র প্রমাণ মানতে হয় যুক্তিশূন্য শাস্ত্রের, দেখা গেছে ফলও তাতে পাওয়া যায়। মন্ত্র বা ধারণী বা ধ্যানের শক্তিতে দেখা গেছে বিষ খেয়েও ঘুমিয়ে-পড়া মানুষ জেগে উঠেছে। সেখানে কি কোনো যুক্তি খাটে? বয়স্য, চুম্বক লৌহকে টানে ঘোরায়; বৈদিক বা অবৈদিক মন্ত্রের বলে অনেক কিছু সিদ্ধ হয়; নানাবিধ দ্রব্যগুণের সংযোগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাতে আমরণ জড় করে রাখা যায় মানুষকে, তাকে বশ করে রাখা যায়, তাকে অপহরণ করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে শাস্ত্র মানা ছাড়া উপায় দেখিনা। আপনি তো জানেনই আগমে বা পুরাণে বা রামায়ণ মহাভারতে সর্ব্বত্রই রয়েছে অভিশাপের কথা। ইন্দ্রত্বকামী রাজর্ষি নহুষ অগস্ত্যের অভিশাপে অজগরের মূর্ত্তি পেয়েছিলেন। রাক্ষসে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সৌদাস। যযাতির যৌবনে জরা, সেও শুক্রাচার্য্যের অভিশাপের ফল। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে মনুষ্যমূর্ত্তিতে যে অষ্টবসুর জন্ম—তার কারণও ঐ অভিশাপ। অভিশাপের

কথা না হয় ছেড়েই দিন। আদি-দেব যিনি জন্মবিহীন স্বয়ং ভগবান—তিনিও জন্ম নিয়েছিলেন জমদগ্নি ঋষির পুত্র হয়ে, নিজেকে চার ভাগে বিভক্ত করে জন্মেছিলেন রাজর্ষি দশরথের ঘরে, কৃতার্থ করেছিলেন বসুদেবকে মথুরায়। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে অসম্ভব নয় মানুষের ঘরে দেবতাদের জন্ম-নেওয়া। মহারাজ, যাঁদের যাঁদের নাম উল্লেখ করলুম সেই সব পুণ্যশ্লোক মহাত্মা অপেক্ষা গুণবৈভবে আপনিও হীন নন। এদিকে চন্দ্রদেব—ভগবান কমলনাভির চেয়ে তাঁর মর্য্যাদা ত আর বেশী নয়। আমি ত এর মধ্যে অসম্ভব কিছু দেখছি না। এই সেদিনের কথা, মহাদেবীর যখন সন্তান সম্ভাবনা হল তখন মহারাজ স্বপ্নে দেখেছিলেন, দেবীর মুখমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন চাঁদ আর আমিও স্বপ্নে দেখেছিলুম মনোরমার অঙ্কদেশে পড়ে রয়েছে একটি শ্বেত শতদল পুণ্ডরীক। ওদের জন্ম বিষয়ে আমার ত মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। আর যদি বলেন নিস্প্রাণ হয়েও কেমন করে অবিনাশী থাকে শরীর, তাহলে তার উত্তরে আমাকে বলতে হয়, বিশ্ব-বিশ্রুত অমৃতই তার একমাত্র কারণ। একথা কে না জানে চন্দ্রমাই অমৃতের আধার। আমার ত মনে হয় এই রকমই একটা কিছু ঘটেছে। যখন চন্দ্রাপীড়ের শরীরে এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করছে সেই মনোমোহিনী শোভা তখন যে তার আত্মা অন্য কোন দেহে সংক্রামিত হয়ে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে, একথা একেবারেই অসম্ভব।”

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে অশ্রুবেগ সম্বরণ করে ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাস্যের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে পুনর্ব্বার বললেন শুকনাস

“এ অভিশাপের অবসান হবেই, অচিরেই হবে। গন্ধর্ব্বলোকের একটি রাজদুহিতাকে বধূরূপে বরণ করে, নয়নজলে সিক্ত হয়ে চন্দ্রাপীড় যখন আপনাদের পাদপদ্মে মাথা নত করে এসে দাঁড়াবে তখন এক মুহূর্ত্তে কোথায় উড়ে চলে যাবে আপনাদের এই সুতীব্র সন্তাপ। অভিশাপ বর হয়ে দাঁড়াবে। সার্থকতা নেই অধীরতার! চন্দ্রাপীড়ের যাতে মঙ্গল হয়, সম্পন্ন করুন সেই সব কাজ। ইষ্টদেবতাকে আরাধনা করে নিয়মক্লেশ সহ্য করে, ক্ষয় করে দিন অকল্যাণ। ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে যা কিছু শ্রেয়স্কর রয়েছে বা আছে বলে জানা যায়, আজ থেকেই আরম্ভ করে দিন সেই সব, বিধান দিন আচার্য্যেরা।

বৈদিক হোক্ অবৈদিক হোক্ কিছুই অসাধ্য নয় ক্রিয়াকর্ম্মের। একদিন এই রকম যাগ-যজ্ঞের ভিতর দিয়েই অতি কষ্টে পাওয়া গিয়েছিল—ভিক্ষুকের রত্ন-পাওয়ার মত—এই চন্দ্রাপীড় আর বৈশম্পায়নকে।”

শুকনাসের জ্ঞান-গম্ভীর পদাবলীতে প্রশমিত হলনা তারাপীড়ের সন্তাপ। তিনি বললেন

“বয়স্য, তুমি ছাড়া কেই বা আর আমাকে সান্ত্বনা দেবে? কিন্তু আমি কি করবো। ‘বৈশম্পায়নের দুঃখে ভেঙে পড়ল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়’—সেই ছবি সমস্ত পৃথিবীকে মুছে ফেলে দিয়ে আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমি তাই দেখছি, একটি একটি করে তাদের প্রতিকথাটি শুনছি। আমার সমস্ত চিন্তাকে যেন তারা গ্রাস করে রয়েছে। শান্তি নেই, তাদের মুখ না দেখা পর্য্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমারি যখন এই দশা, না জানি তখন বিলাসবতীর কি হচ্ছে। শুকনাস, আমাদের যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, সেখানে নিয়ে চল।”

মহারাজের এই অনুরোধকে যেন জীবন্ত করে দিয়ে শুকনাসের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ল বিলাসবতীর ছলছল বিহ্বল দু-নয়নের দৃষ্টি।

•

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন—ক্ষুণ্ণগতিতে—জনৈক ব্রাহ্মণ। অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। শুকনাসের আত্মতুল্য বন্ধু।

স্বস্তিবাচন করে বিলাসবতীকে বললেন

“দেবি, জনরবের অস্পষ্টতায় আকুল হয়ে ছুটে এসেছেন দেবী মনোরমা। মহারাজ রয়েছেন, সেই জন্য তিনি এখানে আসতে পারছেন না। অপেক্ষা করছেন মাতৃগৃহের অন্তরালে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন,—‘লেখহারকরা ফিরে এসে কি বললে? বেঁচে আছে ত বৈশম্পায়ন? ভাল আছে ত সে? যুবরাজের সঙ্গে আবার ত তার দেখা হয়েছে? এখন তারা কোথায়? কবেই বা তারা ফিরবে?’ এখন মহারাণী যা আদেশ করেন।”

নিবেদন শুনে নিদারুণ বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লেন তারাপীড়। কেমন করে এ দুঃসংবাদ জানান যায় বৈশম্পায়নের মাতাকে? মহারাণীর দিকে চেয়ে

দেখলেন—শোকে যেন সহস্র খণ্ড হয়ে গেছে বিলাসবতীর অঙ্গ। শেষে বিলাসবতীকে সম্বোধন করে বললেন "তুমি যাও। তুমি গিয়ে না দাঁড়ালে, তুমি গিয়ে না বোঝালে, কেউ রাখতে পারবে না তোমার প্রিয়সখীর জীবন। তাঁকে বোলো,—আর্য্য শুকনাসের সঙ্গে তাঁকে যেতে হবে।"

ত্বরিত-বিদায় নিলেন সপরিজনা বিলাসবতী। শুকনাসকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজও উঠলেন—যাত্রার উদ্‌যোগে।
রাজপরিবারের আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ বিদ্যুতের মত বিকীর্ণ হয়ে পড়ল উজ্জয়িনীর আকাশে।
নির্ব্বাক হল নাগরিকেরা। চন্দ্রাপীড়ের প্রতি স্নেহে, আশ্চর্য্য দর্শনের কুতূহলে, উতলা হয়ে উঠল নগরীর চিত্ত।
তারপর যখন খবর এল পরমমাহেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তী তারাপীড় প্রবাসযাত্রা করেছেন, তখন উজ্জয়িনীর পুরবাসীরা অনুধাবন করল মহারাজের।
নগরীতে শুধু পড়ে রইল গৃহরক্ষকের দল।

সাম্রাজ্যের কর্ম্ম ফেলে যাত্রা করলেন মহারাজ। যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন সমস্ত নথি-পত্র তোলা রইল রত্নপেটিকায়; প্রলঘু-পরিকর হয়ে, বিপুল জনসমারোহ সঙ্গে নিয়ে, প্রয়াণ-পথটিকে যেন পান করতে করতে, অশান্তহৃদয়ে মৌনমুখে চলতে লাগলেন তারাপীড়।

এ ত একদিনের পথ নয় যে সত্বর পৌঁছে যাওয়া যাবে! দিনের পর দিন যায়। উতলা হয়ে ওঠেন মহারাজ, মাঝে মাঝে অশ্বারোহী ত্বরিতককে শুধু জিজ্ঞাসা করেন "আর কতদিনের পথ বাকি? সময়ে পৌঁছবো ত!" এই রকম করে অবিচ্ছিন্ন যাত্রায় বার্দ্ধক্যের ক্লেশকে অবগণিত করে বহুদিন পরে দেখা পেলেন—অচ্ছোদ সরোবরের তীর। কিন্তু সে তীরে পৌঁছতে কেমন যেন ভয় হল। আশ্রমে কি কাণ্ড ঘটেছে তা জানবার উদ্দেশ্যে ত্বরিতককে পাঠিয়ে দিলেন; ত্বরিতকের সঙ্গে চলল একদল অশ্ব-সৈন্য।

কিছুকাল পরে দেখা গেল মেঘনাদকে সম্মুখে নিয়ে ক্ষিতিতলে মস্তক স্পর্শ করে—নয়নে উদ্বাষ্প দীনতর দৃষ্টি—চন্দ্রাপীড়ের পরিজনেরা এবং রাজপুত্রলোক মহারাজের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

সংস্কার-অভাবে মলিন কৃশ হয়ে গেছে তাদের দেহ,
বেঁচে-থাকার লজ্জায় তারা ভিক্ষা চাইছে বাসুকীর,
মহারাজের দৃষ্টিপথে না পড়ি—এই হচ্ছে প্রত্যেকের একান্ত কামনা।
অক্ষত হয়েও তারা হত, জীবন্ত থেকেও তারা যেন মৃত।
দেহের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাদের একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে উৎসাহ।

তাদের দর্শনে উল্লসিত হয়ে উঠল মহারাজের নয়ন, শোকের তরঙ্গাঘাত সত্বেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাঁর চিত্ত। তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়ে উঠল এই ধারণা যে চন্দ্রাপীড়ের দেহ এখনো রয়েছে অবিনাশী। ঘেরাটোপ-দেওয়া হাওদার আবরণ খুলে তখনি বিলাসবতীকে বললেন

"দেবি, ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। নিশ্চয়ই অবিকৃত রয়েছে কুমারের দেহ। একজনকেও বাদ না দিয়ে ওরা সকলেই এসেছে। অন্য-কিছু হলে ওরা একজনও আমার সামনে এসে মুখ দেখাতে পারত না।"

আবরণের স্বর্ণাঞ্চলখানি কম্পিত হস্তে উৎসারিত করে দীর্ঘকাল চেয়ে রইলেন বিলাসবতী।

দেখলেন যেসব রাজপুত্রদের তিনি নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছিলেন, যারা ছিল তাঁর চন্দ্রাপীড়ের অঙ্গ-সহচর, তারা সকলেই এসেছে; কিন্তু তাদের মধ্যে নেই—কেবল তাঁর চন্দ্রাপীড়।

দেখতে দেখতে অশ্রুধারায় ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। রাজকুলদুর্ল্লভ ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে উঠল অচ্ছোদের তীর।

মহারাণীকে আশ্বস্ত করে প্রণত মেঘনাদকে মহারাজ আদেশ দিলেন—"মেঘনাদ, বল, চন্দ্রাপীড়ের খবর আমাদের জানাও।"

নিবেদিত হল

"দেব, কুমারের দেহে চেতনার বিরহ ঘটেছে। ঘুমন্তের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে

শয্যায় তিনি শয়ন করে রয়েছেন। কিন্তু আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করেছি, দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাঁর দেহের প্রতি-অঙ্গের শোভা”

এই অপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণ করে আনন্দস্ফীত হৃদয় নিয়ে করেণু-পৃষ্ঠে মহাশ্বেতার আশ্রমে দ্রুত প্রবেশ করলেন তারাপীড়।

ভ্রমরগুঞ্জিত গুহার সম্মুখে যে শিলাবেদিকাটি রাখা ছিল সেই বেদিকায় উপবেশন করে তখন ধ্যান করছিলেন আর্য্যা মহাশ্বেতা।

পুণ্ডরীকের ধ্যান।

এমন সময় সহসা তাঁর কাছে সংবাদ এল—আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন চন্দ্রাপীড়ের গুরুজন।

বজ্রপাতের চেয়েও তীব্র এ সংবাদ।

মহাশ্বেতার নয়নে জ্বলজ্বল করে উঠল মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু। দগ্ধবিধিকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন

“চিরকাল দুঃখ সইতে কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ? ভুলেও কি আমার মরণ হবে না! আমি কি আশীর্ব্বাদ পেয়েছি তিল তিল করে দগ্ধ হবার!”

লজ্জায়, ক্ষোভে, বেদনায় নীল হয়ে গেল তাঁর শুভ্র শোভা। শিলাবেদিকা ত্যাগ করে তিনি দ্রুতচরণে আশ্রয় নিলেন—গুহার নির্জনতায়।

‘মহারাজ তারাপীড় এসেছেন’—এই সংবাদ যখন চিত্ররথতনয়া কাদম্বরীর কাছে পৌঁছল তখন তাঁকে দেখে মনে হল আকাশের বিদ্যুতে যেন স্পৃষ্ট হল নবমালতীর লতা।

নয়নে দেখলেন অন্ধকার।

কাদম্বরীর সখীদের সঙ্গে সঙ্গে কাদম্বরীর দেহটিকে ধরে ফেললেন মূর্চ্ছা।

মনোরমার হাত ধরে যখন গুহার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন দেবী বিলাসবতী, তখন তাঁর মাতৃদৃষ্টি প্রথমেই দেখতে পেল শিলাতলশায়ী চন্দ্রাপীড়ের মূর্ত্তি;—অপূর্ব্ব একটি কান্তি যেন ভালবেসে জড়িয়ে রয়েছে কুমারের দেহটিকে।

বিলাসবতীর মনে হল—এরা সব মিথ্যা বলেছে, এরা ভুল বলেছে। কে বলেছে—তাঁর কুমার নেই, ও ত ঘুমিয়ে আছে!

ধরণীকে সিক্ত করে কতবার তার নাম ধরে ডাকলেন, আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে জাগাবার কত চেষ্টা করলেন, কানের কাছে মুখ নিয়ে কতবার বললেন "ওঠ ওঠ।"

যখন জাগল না চন্দ্রাপীড়, যখন উঠল না সে, তখন ভর্ৎসনা করতে লাগলেন তাকে।

"এ কী রকমের ছেলে তুই? কতদূর থেকে বাপ এল, প্রণাম করে জড়িয়ে ধরলিনি তার পা! এই কি তোর স্নেহ! এই কি ধর্ম্ম! তুই না তোর বাপকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতিস।"

এতেও যখন খুলল না চন্দ্রাপীড়ের চোখ, তখন তিনি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন, বললেন "তবে সুখে আছিস সুখে থাক। এবার বলিসনি যেন—মা আমাকে ভালবাসে না। আমি তোকে আর ভালবাসবো না।"

এই বলে হঠাৎ উন্মাদিনীর মত চীৎকার করে উঠলেন মাতা বিলাসবতী। চন্দ্রাপীড়ের ললাটে, কপোলে, বক্ষে, চরণে অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়তে লাগল অবিরল আলিঙ্গন ও চুম্বন।

শুকনাসের হাতে হাত রেখে উপস্থিত হলেন তারাপীড়। যে তারাপীড়ের দুখানি বাহু নিখিল প্রজাকুলের পীড়া অপহরণ করতে সর্ব্বদা ব্যগ্র, সেই তারাপীড় আত্মপীড়াকে স্তম্ভিত করে আলিঙ্গন করলেন না চন্দ্রাপীড়ের দেহটিকে। বললেন

"দেবি, শান্ত হও, এ আমাদের বহু পুণ্যের ফল, যে আমরা দেবতাকে পুত্ররূপে পেয়েছি। শোক করতে নেই। কেঁদে উঠতে নেই সামান্য মানুষের মত। আর শোক করেই বা কি হবে? কেবল চীৎকার করে গলাই ফাটবে, ফাটবে না ত হৃদয়। প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে না ত প্রাণ। চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে না ত শরীর। শোক ভুলে যাও। চেয়ে দেখ একবার মনোরমা আর শুকনাসের দিকে; তুমি ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ তোমার ছেলেটিকে, ওদের যে সে নেই।"

তারপরে শিলাতলের অনতিদূরে মূর্চ্ছাভিহতা কাদম্বরীর দিকে বিলাসবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন

"যার পুণ্যপ্রভাবে পুনর্ব্বার আমরা পুত্রের মুখ দেখতে পেয়েছি, যে আমাদের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে উৎসবের আনন্দ, সেই গন্ধর্ব্বরাজপুত্রী বধূ—কাদম্বরী 'আমরা এসেছি' এই সংবাদ পেয়ে শোকের নিদারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে রয়েছে। ওর প্রিয়-সখীরা ফিরিয়ে আনতে পারছে না ওর জ্ঞান। তুমি ওকে কোলে তুলে নাও, ফিরিয়ে আন ওর চেতনা। তারপর যত ইচ্ছে হয় কাঁদ।"

বিলাসবতীর মুখ থেকে শুধু বেরোলো "ঐ বুঝি বধূ কাদম্বরী"; তারপরে দ্রুত-চরণে সেখানে উপস্থিত হয়ে আদর করে ক্রোড়ে তুলে নিলেন কাদম্বরীর মূর্চ্ছাশিথিল তনুখানি।

অপলক দৃষ্টিতে তিনি দেখতে লাগলেন কাদম্বরীর রূপ।

কাদম্বরী যে মূর্চ্ছিত হয়েছে—এই স্মৃতি ক্ষণকাল পরিত্যাগ করল তাঁর চিন্তাকে। কি অপূর্ব্ব তাঁর বধূর রূপ।

যদি বরণ করতে হয় বধূ, এমনি বধূই যেন সকলে বরণ করে নেয়। বিলাসবতীর কাছে কাদম্বরীর মূর্চ্ছানিমীলিত নয়নের অপূর্ব্ব চিক্কণ শোভা দ্বিগুণ সুন্দর হয়ে দেখা দিল,—তাঁর মনে হল যেন লজ্জালীলায়িত দেহে তাঁর বধূ তাঁকে এই প্রথম দেখাচ্ছে মুখ—লজ্জায় মুকুলিত করে নয়নের পদ্ম।

পরক্ষণেই ফিরে এল মূর্চ্ছাজ্ঞানের স্মৃতি। নিজের অশ্রুস্নাত কপোল দিয়ে শীতল করে দিতে লাগলেন বধূর কপোল, লোচন দিয়ে লোচন।

তারপরে চন্দ্রাপীড়ের স্পর্শস্নিগ্ধ নিজের হাতখানিকে কাদম্বরীর বুকের উপর রেখে বললেন

"তুই আমার অমৃতময়ী মা, মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অমর করে রেখেছিস আমার চন্দ্রাপীড়কে।"

বিলাসবতীর স্নেহস্পর্শে, চন্দ্রাপীড়ের নাম-গ্রহণে, ফিরে এল কাদম্বরীর জ্ঞান। মহারাণীর অঙ্ক থেকে মদলেখা নামিয়ে নিল লাজমুখী কাদম্বরীকে।

মূর্চ্ছা শেষ হতেই কাদম্বরী যথাক্রমে বন্দনা করলেন গুরুজনদের,—পরবর্তীর মত।

"আয়ুষ্মতি, তুমি চিরকাল সধবা থাক," এই আশীর্ব্বাদ করে মহারাণী বিলাসবতী নিজের পার্শ্বে টেনে নিলেন কাদম্বরীকে।

মহারাজ তারাপীড়ের মনে হল, যেন বেঁচে উঠেছে তাঁর চন্দ্রাপীড়। কাদম্বরীকে বুকে টেনে নিয়ে গণ্ডদেশে চুম্বন দিয়ে দীর্ঘকাল চেয়ে রইলেন কাদম্বরীর মুখের দিকে। তারপর তার মাথায় হাত দিয়ে মদলেখাকে বললেন

"মদলেখা, তোমার হাতেই সমর্পণ করে দিলুম আমার বধূটিকে, তুমি তাকে দেখো। যে সব উপচার এবং ব্রতের ভিতর দিয়ে চন্দ্রাপীড়কে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে তাতে যেন ব্যাঘাত না ঘটে, অনুরোধ বা লজ্জার অবকাশে যেন তার পরিবর্ত্তন না হয়। আমরা নিষ্প্রয়োজন দর্শক-মাত্র। আমরা থাকলেও যা গেলেও তা। যার করস্পর্শে আপ্যায়িত হয়ে অবিনাশী হয়ে রয়েছে চন্দ্রাপীড়ের দেহ, আমার সেই বধূ কাদম্বরীটিকে তুমি দেখো।"

বিদায় নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

নিকটবর্ত্তী একটি আশ্রমে—যেখানে বিরচিত হয়েছিল সাময়িক নিকেতন—সেইখানে শুভ্র শিলাসনাথ একটি লতামণ্ডপে উপবেশন করে মহারাজ তারাপীড় আহ্বান করলেন রাজন্যমণ্ডলীকে। আদর অভ্যর্থনা করে পরিশেষে বললেন

"এখন আপনাদের কাছে যা বলব আশা করি আপনারা মনে করবেন না, আমি শোকের আবেগে বা আত্মবিস্মৃত হয়ে বলছি। বহুদিন থেকেই এই আশা হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছিলুম, বধূর মুখ দেখে চন্দ্রাপীড়কে সিংহাসনে বসাব, রাজ্যের ভার তার হাতে সমর্পণ করে বিশ্রাম নেব;—কোন এক আশ্রমের নির্জ্জন পবিত্রতায়। শেষ বয়সটা কাটিয়ে দেব সুখে। কিন্তু ভগবান কৃতান্ত, হয়ত বা আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি

ভেবে দেখেছি এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য। পুত্র থেকে যে সুখ পাওয়া যায় অনেক চেষ্টা করেও শেষ-পর্য্যন্ত আমি তা পেলুম না। আপনাদের বাহু এবং সুজনতার উপর নির্ভর করেই এতদিন আমি ভোগ করেছি প্রজাপালনের পুণ্যফল। আপনাদের কাছে আমার এই শেষ মিনতি,—যেন আমার প্রজাপুঞ্জ আপনাদের সেই শক্তি এবং সুজনতার আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়।"

নিস্তব্ধ হয়ে রইল রাজচক্র। অবকাশ না দিয়ে মহারাজ পুনর্ব্বার বললেন

"আমার শেষ সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না। তনয়ের উপর আত্মভার সমর্পণ করে, জরায় পীতসার দেহ নিয়ে, লঘুশরীর হয়ে পরলোকে যাঁরা গমন করেন তাঁরা ধন্য। যমরাজ একদিন সকলকেই টানবেন, ইচ্ছা না থাকলেও গলায় পা দিয়ে ধ্বংস করবেন এই দেহটাকে; তবু আমার মনে হয়—যতই জরায় পান করুক না কেন আয়ু, যতই নিষ্প্রয়োজন গলিত শীর্ণ হোক না কেন এই জড় মাংসের পিণ্ডটা, যোগ্যপাত্রে ঐহিক সমস্ত কিছু অর্পণ করে তবুও মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে। ঐটুকু তার লাভ। আমার সব সাধ মিটেছে। আমাকে বিদায় দিন।"

সেইদিন থেকে বিসর্জ্জিত হল তারাপীড়ের সম্রাটত্বের সমস্ত অভিজ্ঞান।

মহারাজা তারাপীড় আরম্ভ করলেন অরণ্যবাস।

ধীরে ধীরে তাঁর দেহে, পরিবেশে এবং চিন্তায় দেখা দিল বৈরাগ্যের উদাসীন বৃত্তি।

চীর-বল্কলে মিটল তাঁর বসনের সৌখিনতা,
জটায়—কুন্তলরচনার সাধ,
কন্দমূল আর ফলে—আহারের পারিপাট্য,
মৌনতায়—আজ্ঞা এবং
তপস্যায়—কোশস্পৃহা।

একদা যে জয়েচ্ছা বিপুল পৃথিবীকে পদানত করে তাঁকে সম্রাট্ করে দিয়েছিল, কোথায় উড়ে গেল সেই জিগীষা, তার বদলে এল পরলোক-জয়ের আকাঙ্ক্ষা।

নর্ম্মালাপ পর্য্যবসিত হল ধর্ম্মকথায়,
সমররস—শান্তরসে,
শস্ত্রধারণের ব্যসন—জপমালিকার চালনায়।
বন্ধুস্নেহ প'ড়ল অরণ্যের মৃগে,
লতায় জন্মাল অন্তঃপুরিকাপ্রীতি এবং
বৃক্ষমূলে হর্ম্ম্যবুদ্ধি।

অরণ্যের সমস্ত তরুরাজ্যে জেগে উঠল তাঁর সন্তান-বাৎসল্য।

এই রকম করে কেটে যেতে লাগল তারাপীড়ের ও বিলাসবতীর দিন, শুকনাস ও মনোরমার।

* * * *

এই পর্য্যন্ত বলে ভগবান জাবালি হারীত-প্রভৃতি তাপস শ্রোতাদের মুখের দিকে পুণ্যদৃষ্টি ফেলে চাইলেন। শিথিলচর্ম্ম ওষ্ঠের শেষপ্রান্তে কল্লোলিত হয়ে উঠল একটি স্নিগ্ধ হাস্য। বললেন "তোমরা দেখলে ত, কথা-রসের কি একটি অন্তঃকরণ-কেড়ে-নেওয়া অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। যে কথাটি বলতে গিয়েছিলুম সেই কথা থেকে কোথায় দূরে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই কথা রসের ঢেউ।

আত্মকৃত অবিনয়ের ফলে দিব্য-লোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে একদিন মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়েছিল, তারপরে লালসার বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে লাভ করেছিল গান্ধর্ব্বীর অভিশাপ—এই শুক সেই শুকনাসপুত্র বৈশম্পায়ন। দেখলে ত অবিনয়ের ফল কোথায় চলেছে গড়িয়ে।"

এই বলে তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন অঙ্গুলি দিয়ে।

* * * *

মহারাজ আমি শিশু হলে হবে কি! ভগবান জাবালির কথা-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ফিরে আসছিল জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি। সুপ্তির রাজ্য থেকে যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসছিলুম জাগরণের রাজত্বে।

কথাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাগ্রে ফিরে পেলুম সমস্ত বৈদগ্ধ। নিখিল কলায় জাগল নিপুণতা। মানুষে যে রকম আনন্দে কথা বলতে পারে আমারো মুখে সেই রকম স্ফূর্ত হতে লাগল স্পষ্টাক্ষরা বাণী। মনে পড়ে যেতে লাগল বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান। শুধু ফিরে এল না মানুষের মত আকৃতি।

আমি আমার শুকদেহের দিকে দৃষ্টি ফেলে চমকিত হয়ে উঠলুম। আমিই কি সেই বৈশম্পায়ন? সংশয়ের অবকাশ পেল না চিন্তা। হৃদয়কে দীপিত করে কোথা থেকে জেগে উঠল চন্দ্রাপীড়ের উপর আমার সেই অগাধ ভালবাসা, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে উন্মাদ এক আত্মহারার মহাশ্বেতাকে গ্রহণ করবার দুর্দ্দমনীয় আশা, প্রভাতের অরুণোদয়ের মত অনুরাগের সলজ্জ বিস্ফুরণ, তারপরে না-পাওয়ার বিশ্বশোষী দুঃখ, সর্ব্বশেষে নির্ম্মম প্রত্যাখ্যান। সমস্তই ফিরে এল। কেবল আমার পক্ষোদ্‌ভেদ না হওয়াতে সেই সময় ফিরে এল না আমার পূর্ব্বজন্মের আঙ্গিক চেষ্টা। মনে জাগল মাতাপিতার কথা, তাত তারাপীড়, অম্বা বিলাসবতী। এঁরা কি এখনো আমাকে মনে রেখেছেন? ভুলে যায়নি ত আমাকে আমার বয়স্য চন্দ্রাপীড়? আমার প্রথম সুহৃৎ—কপিঞ্জল—কিই বা সে ভাবছে?

স্মৃতি ও নয়নের তারায় বারংবার ভেসে উঠতে লাগল—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ এবং উন্মুখ করে—আশ্রমের মর্ম্মর-বেদিকায় ধ্যানরতা মহাশ্বেতার পরিপূর্ণ শুভ্রতম মূর্ত্তি,—ব্যগ্র পবনে দুলছে তার অলকের ভঙ্গ, চরণের নখ-মাণিক্যে ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না।

মাটিতে মাথা ছুঁয়ে ভগবান জাবালির দিকে স্থিরনেত্রে ক্ষণভর একবার চেয়ে দেখলুম। দেখলুম তিনিও আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁকে দেখে কেমন যেন ভয় হল। তিনি কি তবে জানতে পেরেছেন আমার হৃদয়ের বেদনা, বুঝতে পেরেছেন মনের গোপন কথাটি? লজ্জায় যেন বিলীন হয়ে যেতে চাইল আমার দেহ। কে যেন নিভৃতকণ্ঠে বলে গেল আমাকে—'খোলা রয়েছে রসাতলের দ্বার'। কিন্তু কি করি, শেষে ধীরে ধীরে নিবেদন করলুম।

"ভগবন, আপনার প্রসাদেই ফিরে পেয়েছি লুপ্ত জ্ঞান, মনে পড়ে

যাচ্ছে পূর্ব্ববান্ধবদের সকলকেই। স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য বলে বোধ হচ্ছে বিরহ। আমার মৃত্যুসংবাদ কর্ণে প্রবেশ করামাত্রই যার মৃত্যু ঘটেছিল সেই আমার বয়স্য চন্দ্রাপীড়, জন্ম নিয়ে কোথায় এখন রয়েছে আমাকে বলুন। আমার এই পাখীর দেহ নিয়ে যদি তার কাছে একমুহূর্ত্তও থাকতে পাই তাতে শান্তি পাবো।"

ভগবান জাবালির কণ্ঠের স্নেহ-ক্রোধ যেন উদ্দণ্ড হয়ে আমাকে বলল "দুরাত্মা, দুর্দ্দশার চরম সীমান্তে পৌঁছেও এখন ভুলতে পারছিস না হৃদয়ের চঞ্চলতা? আগে ডানা মেল্, তারপর প্রশ্ন করিস আমাকে।"

কুতূহলী হয়ে উঠল হারীত। বললে "তাত কি আশ্চর্য্য! এখনো ডানা গজাল না, এখনি উড়তে চায়! কী এমন ঘটেছে যাতে বেঁচে থাকাও এর পক্ষে দায়! আর দিব্যলোকেই যার জন্ম তারই বা আয়ুঃ এমন অল্প হবে কি করে?"

উত্তর এল

"এর কারণ অতি স্পষ্ট। হারীত, এর জন্ম কাম-রাগ-মোহময় কেবল অল্পসার স্ত্রী-শক্তি থেকে। বেদেও পড়েছি, যারা এমনভাবে জন্মায় তারা এই রকমেরই হয়। এই পৃথিবীতে দেখা যায়—কারণের গুণ সংক্রামিত হয় কার্য্যে। আয়ুর্ব্বেদেও বলে—যারা অল্পসার স্ত্রী-শক্তি থেকে জন্মলাভ করে তারা স্থৈর্য্যহেতু সারভূত পুরুষশক্তির সম্পূর্ণ অভাববশতঃ, হয় গর্ভেই লয় পায়, হয়ত বা মৃতই জন্মায়, নয় জন্মলাভ করেও দীর্ঘকাল বাঁচে না। এই শুকশিশুরও সেই রকম জন্ম। প্রায়ই দেখা যায় প্রবৃত্তির অতিবেগ সহ্য করতে না পেরে এরা মরে। এই শুকশিশুরও আয়ুঃ অল্প। অভিশাপের অবসান হলে ফিরে পাবে অক্ষয় আয়ুঃ।"

এই কথা শুনে আমি মিনতিভরে বললুম "ভগবন, আমার উদ্ধারের জন্য এতই যখন আপনি করলেন, তখন আমাকে উপদেশ দিন কী উপায়ে আমি ফিরে পেতে পারি অক্ষয় আয়ুঃ।

"যখন সময় হবে তখন সবই জানতে পারবে"।

তারপরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে মহর্ষি বললেন

"বৎসগণ, আজ এইখানেই তবে শেষ করি আমার কথা। রস-বস্তুর এমনি আকর্ষণ—যে আমরা ভুলেই গেছি, কখন দীর্ঘ রজনী প্রভাত হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছেন—অমার্জ্জিত রৌপ্যকুম্ভের মত—কান্তিবিরহিত চন্দ্রমা। রক্তপদ্মের জীর্ণ পাপড়ির মত আভা ছড়াতে ছড়াতে পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়েছেন অরুণালোকের অগ্রদূত। দেখেছ, তমোময়ী রজনীর পুঞ্জপুঞ্জ কেশ-সম্ভারের মাঝখান দিয়ে কেমন আঁকা হয়ে চলেছে সিন্দুর-দেওয়া সীঁথির একখানি অপূর্ব্ব ছবি। আলোকের আক্রমণে অবসন্ন হয়ে পড়েছে তিমির। জ্যোতির অন্তঃপুরে ক্রমে ক্রমে অঙ্গ গোপন করছে ছোটর পর ছোট, বড়োর পর বড়ো একটি একটি করে বিচিত্র তারার দল। ঐ শোন, পম্পার পদ্মবন থেকে ভেসে আসছে হংসকামিনীদের প্রভাতিয়া গান। ঐ দেখ, অরণ্যমঞ্জরীদের অঙ্গ থেকে সৌরভ চুরি করে কেমন শিশুর মত ছুটে আসছে প্রভাতপিশুন সমীরণ।"
সভা ভঙ্গ করে গাত্রোত্থান করলেন ভগবান জাবালি।
অগ্নিবিহারবেলা আসন্ন।

বিদায় নিলেন ভগবান জাবালি, কিন্তু দেখতে পেলুম,—বৈরাগ্য যাঁদের ধর্ম্ম, মোক্ষমার্গেই যাঁদের অবস্থান—সেই সমস্ত মুনি-ঋষিদের পরিষদ কথা-রসের মাধুর্য্যে গুরুসেবা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন; মুখে বিস্ময়োৎফুল্ল ভাব, নয়নে শোক এবং আনন্দ-জন্মা অশ্রু।
তাঁদের মধ্য থেকে হারীত আমাকে তুলে নিয়ে চলে এল নিজের কুটিরে। শয়নের একপার্শ্বে আমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল প্রাভাতিক-বিধির উদ্যোগে।

কুটিরের বিজন স্তব্ধতায় কেঁদে উঠল আমার অন্তরাত্মা। সমস্ত কার্য্যে অক্ষম আমার এই শুকদেহটাকে নিয়ে আমি কি করব! একেই ত মানুষ হয়ে জন্মান দুর্ল্লভ, তার উপর ব্রাহ্মণ, তারপরে মুনিত্ব, তারপরে আসে দিব্যলোকে বাস। আত্মগ্লানিরও বাইরে গিয়ে পৌঁচেছি। কোন্ এক উর্দ্ধলোক থেকে আত্মদোষে কি অদ্ভুত অধঃপতন! কি হবে এই জীবনের যন্ত্রণাটাকে বয়ে বেড়িয়ে? শেষ করে দেওয়াই ভাল।

নয়ন নিমীলিত করে আত্মহত্যার কথা ভাবছি এমন সময় আমার প্রাণটাকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সহসা কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল হারীত। মুখে উজ্জ্বল হাসি। বললে "ভাই বৈশম্পায়ন, অদৃষ্ট ফিরেছে। মহামুনি শ্বেতকেতুর পদমূল থেকে কপিঞ্জল এসেছেন। তোমাকে দেখতে চান।"

শোনামাত্রই আমার মনে হল যেন আমার ডানা গজিয়ে উঠেছে, যেন আমি উড়ছি। আনন্দে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করলুম "কপিঞ্জল এসেছে? সে কোথায়?" "তিনি পিতৃদেবের নিকটে বসে রয়েছেন।" "দেরী করো না, আমাকে এখনি নিয়ে চল, আমি সহ্য করতে পারছি না।"

হারীত আমাকে দ্রুত সেখানে নিয়ে এল।

কপিঞ্জলকে দেখে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার কথা বেরল না মুখ থেকে। উন্মাদ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলুম।

দেখলুম—

আকাশ থেকে সে নেমে এসেছে, ছিঁড়ে গেছে তার জটার বাঁধন; পথশ্রমে ক্লান্ত তার শরীর।

আকাশগঙ্গা পার হয়ে সে এসেছে, তখনো মুখ থেকে ঝরছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। মরতে মরতে,—আমার স্নেহে নিজেকে যেন টুকরো টুকরো করে দিয়ে,—ছুটে এসেছে সে। ছিঁড়ে গেছে তার যজ্ঞোপবীত।

কী দশা তার চেহারার! বুকের হাড়গুলো পর্য্যন্ত গোণা যায়। তাকে দেখে ঘৃণা করতে লাগল নিজেকে। তার কৃতজ্ঞতা, তার স্নেহ, তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের কাছে আরো পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিতে লাগল আমার নিজের অকৃতজ্ঞতা, রুক্ষতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতা। সে যেন মিত্র আমি যেন বৈরী, সে যেন অমৃত আমি যেন বিষ।

আমার চোখের জল সে দেখতে পেল কি না জানি না। জানি না সে বুঝতে পেরেছিল কি না, আমার পক্ষ থেকে তাকে অভ্যর্থনার প্রয়াস। কেঁদে উঠে তাকে বললুম

"সখা কপিঞ্জল, দুটো জন্মের পরে তোমাকে আজ দেখতে পেয়েছি। বাহু মেলে বুকের মধ্যে নিয়ে তোমাকে যে গাঢ় আলিঙ্গন দেব সে ক্ষমতাও আমার নেই।
কোন কথা বলল না কপিঞ্জল।
আমাকে হাতে করে তুলে নিল। বিরহ-দুর্ব্বিল বক্ষের মধ্যে আমাকে চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে রইল। ছোট্ট বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম তার বক্ষের তড়িৎস্পন্দন। সে আমাকে মাথায় তুলে নিল। আমার ছোট্ট পা দুটোকে ভিজিয়ে দিতে লাগল কান্নায়।
বললুম

"কপিঞ্জল, আমার মত একটা পাপীর জন্য কেন তুমি এতটা কষ্ট করতে গেলে? তুমি কিশোর ব্রহ্মচারী, নির্ব্বাণমার্গের তুমি পথিক; তুমি কেন নিজেকে জড়াচ্ছ সংসারের বেড়াজালে? একি অদ্ভুত তোমার প্রেম! এখনো বলছি, ছেড়ে দাও—অন্ধের মত পথ-চলা।"
কপিঞ্জল কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, হাত দিয়ে বুলোতে লাগল আমার ডানা। তার সেই আদরে ফিরে পেলুম যেন জন্মান্তরের স্পর্শ। দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম,—ক্ষণকাল। তারপরে বললুম

"কপিঞ্জল, তুমি একটা আসন নিয়ে বোসো। আমাকে বল যা ঘটেছে। কুশলে আছেন ত পিতৃদেব? আমাকে মন থেকে বিদায় করে দেননি ত? বড় দুঃখ দিয়েছি তাঁকে। আমার এই বৃত্তান্ত শুনে তিনি কি বললেন? নিশ্চয়ই খুব রেগে রয়েছেন।"

হারীতের একটি শিষ্য নবপল্লবের একখানি আসন পেতে দিয়ে গেল। কপিঞ্জল আমাকে কোলে নিয়ে তাতে বসল। হারীতের নিয়ে-আসা পূর্ণপাত্র থেকে জল ঢেলে মুখ প্রক্ষালন করে বললে

"সখা, ভালই আছেন মহামুনি শ্বেতকেতু। তিনি দিব্যনেত্রে আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের এই ঘটনা। বিচলিত হয়ে প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করেছিলেন যজ্ঞ। তুরঙ্গজন্ম থেকে উদ্ধার পেয়ে যখন মহা-মুনির পদমূলে গিয়ে উপস্থিত হই তখন দেখি যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে। দুর

থেকেই তিনি আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন আমার সশঙ্ক দীন মুখ। আমাকে আহ্বান করে বললেন 'তোমার ত কোন দোষ নেই, ভয় পাও কেন? আমার বুদ্ধির দোষেই এ সমস্ত ঘটেছে। পুণ্ডরীকের জন্মের সময় থেকেই আমার জ'না ছিল তার জীবনে এ রকম একটা কিছু ঘটতে পারে। আয়ুষ্কর যজ্ঞ করলেই সব মিটে যেত। নিজের বুদ্ধির দোষেই পূর্ব্বে তা করা হয়নি। সেই যজ্ঞ এখন সিদ্ধপ্রায়। অশান্তিতে উতলা কোরনা তোমার চিত্ত। আশ্রমে এখন থাক।'

শঙ্কাহীন হয়ে নিবেদন করলুম 'যেখানে আমার সখা জন্মগ্রহণ করেছে সেখানে যেতে আমাকে আজ্ঞা করুন।' তিনি বললেন 'কপিঞ্জল, শুকজাতিতে পতিত হয়েছে পুণ্ডরীক। তুমি গেলেও এখন সে হয়ত তোমায় চিনতে পারবে না। তার চেয়ে বরং তুমি এখানেই থাক।'

আজ সকালে আমাকে ডেকে বললেন 'মহামুনি জাবালির আশ্রমে পুণ্ডরীক এসে পৌঁচেছে। ফিরে পেয়েছে সে পৌর্ব্বিকী স্মৃতি, তুমি সেখানে যাও। আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে তাকে বোলো 'পুণ্ডরীক, যতদিন না যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, জাবালির পদমূলে তুমি থাকবে। তোমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে তোমার মাতৃদেবী লক্ষ্মী যজ্ঞের পরিচারিকা হয়ে রয়েছেন।'

বয়স্য, লক্ষ্মীদেবীও তোমার মস্তক আঘ্রাণ করে তোমাকে বলতে বলেছেন,—যেন এই আদেশের তিলমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে।"

এই কথা বলে কপিঞ্জল আমার গায়ের উপরে বোলাতে লাগল তার হাতখানি। অকঠোর শিরীষফুলের অগ্রকেশরের মত আমার কচি কচি রোঁয়ার ভিতর দিয়ে যেন ঝরে পড়তে লাগল স্নেহের অমৃত। আমি তাকে বললুম

"দুঃখ কোরো না। আমিও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি, হতভাগ্য আমার জন্য তুরঙ্গের দেহ ধারণ করে কি যন্ত্রণাই তুমি পেয়েছ। যে মুখ দিয়ে পান করতে সোমরস,—ভাবতেও ভয় হয়—সেই মুখেই তুমি সহ্য করেছ দাহানার লৌহ কঠিন রূঢ়তা, মুখ চিরে ক্ষত থেকে ঝরে পড়ছে রক্তাক্ত ফেনা। যে লোকের কোমল পল্লবশয়নে শয়ন করাই ছিল অভ্যাস, তাকে সহ্য করতে হয়েছে মেরুদণ্ডভাঙা অশ্বসজ্জার গুরুভার, বর্ম্মের কত রূঢ় আঘাত, নিষ্ঠুর কশার কত তাড়না।"

পূর্ব্ববৃত্তান্তের পর্য্যালোচনার ভিতর দিয়ে দুঃখসুখে মিশে কেটে গেল সেদিন-কার সকাল। তখনকার মত আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি পাখী হয়ে রয়েছি জাবালি মুনির আশ্রমে।

আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল দুটি মুনি-কুমারের কথা;—বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ করে মন্দারতরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় কেমন তারা বেড়িয়ে বেড়াত, মন্দাকিনীরম হেমপদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ে নৌকা ভাসাত জলে, সপ্তবায়ুর স্তরে স্তরে কেমন উড়িয়ে চলত গেরুয়া রঙের উত্তরী।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল। প্রখর হয়ে উঠল সূর্য্যের তাপ। হারীতে এল, কপিঞ্জলকে নিয়ে গেল মধ্যাহ্নভোজনে। ফিরে এসে কপিঞ্জল আমাকে বললে

"তোমার পিতৃদেব যে আদেশটি জানাবার জন্যে তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন সে আদেশ তোমাকে জানিয়েছি। যতদিন না আয়ুষ্কর যজ্ঞের সমাপ্তি হয় ততদিন মহামুনি জাবালির পদমূল থেকে একপাও তুমি নড়না। আমি যাই; সেখানে অনেক কাজ রয়েছে বাকী।"

তীব্র বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার হৃদয়। কিছুই বলতে পারলুম না, জিহ্বায় এল জড়তা। শেষে অনেক কষ্টে বললুম

"সবই ত দেখে গেলে। তাঁরাও হয় ত সব জানেন; আমার কিছু বলবার নই।"

হারীতের উপর আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে, আমাকে একবার বুকে তুলে নিয়ে আদর করে বিদায় নিল কপিঞ্জল। উন্মুখ ঋষিবালকদের বিস্ময় জাগিয়ে অন্তরীক্ষে হল অন্তর্হিত।

হারীত এবং আশ্রমবালকদের কঠোর তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি দিন। আমার ডানা গজাল। যখন উড়বার শক্তি এল তখন একদিন স্থির করলুম

"ওড়বার ত শক্তি পেয়েছি! চন্দ্রাপীড়ের যে কি হল তা বুঝতে পারছি না।.........আশ্রমেই রয়েছে মহাশ্বেতা। তাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখা যুগান্তরের দুঃখ। তার কাছেই যাবো।"

সেদিন সকাল হয়েছে।

প্রাতর্বিহারের জন্যে বাইরে ছেড়ে দিয়েছে আমাকে ঋষিবালকেরা, রয়েছে অন্যমনস্ক; আমি হাওয়ায় ডানা মেলে উঠে পড়লুম আকাশে। কোনদিকে না চেয়ে চলতে লাগলুম সেই দিকে যে দিকে জ্বলে ধ্রুবতারা।

বেশী দিন উড়তে শিখিনি, কিছুদূর অগ্রসর হতেই ভেরে এল ডানা। তবুও চলতে চেষ্টা করলুম। শেষে শরীর অবসন্ন হল, পিপাসায় শুকিয়ে গেল ঠোঁট, কণ্ঠকে কাঁপিয়ে দিয়ে নাড়ি ছিঁড়ে উঠতে লাগল শ্বাস। কোথায় পড়ি কোথায় পড়ি—শিথিল পক্ষ নিয়ে শেষে পড়ে গেলুম সরোবরের তীরে, এক নিকুঞ্জের পল্লবঘন শিখরে। চুপ করে পড়ে রইলুম। ধীরে ধীরে হ্রাস হতে লাগল অবসাদ।

পত্রান্তরাল দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলুম। দেখি, জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই। রৌদ্রকে বিতাড়িত করে কে যেন বিছিয়ে রেখে গেছে তমস্বিনীতিমিরের মত সুন্দর গাঢ় একটি ছায়া।

নিকুঞ্জের শিখর থেকে ধীরে ধীরে নামলুম মাটিতে। সরোবরের তীরে-যেখানে পত্রচ্ছায়ার আশীর্ব্বাদ পেয়ে জল ছিল শীতল, অরবিন্দের রেণু মেখে জল হয়েছিল সুরভি, মৃণালের অঙ্গ থেকে রস নিয়ে হয়েছিল তিক্তমধুর—সেই-খানে আত্মগোপন করে আমি পরম তৃপ্তিভরে পান করলুম জল। তারপরে সরোবরের তীরে খুঁজে খুঁজে আহার করলুম অকঠোর পদ্মবীজ আর বীরতরুর পত্রাঙ্কুর ফল।

অপরাহ্ণে আবার খানিকটা পথ উড়ে চলব—এই স্থির করে অক্ষম দেহটিকে বিশ্রাম দেবার উদ্দেশ্যে আরোহণ করলুম তরুর একটি শাখায়। অবিচ্ছিন্ন ছায়া দেখে একটি স্থান বেছে নিয়ে কোমল পত্রশয়নে এলিয়ে দিলুম আমার অঙ্গ। একে সবে উড়তে শিখেছি, তায় পথচলার শ্রান্তি—ঘুম আসতে দেরী হল না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখি—আমি বাঁধা পড়ে গেছি পাখাধরার জালে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেতপতির মত কালো, লোহার পরমাণু দিয়ে যেন গড়া একটি ভয়ঙ্কর পুরুষ।

ক্রোধের কোন কারণ নেই অথচ তার ললাটের উপর বেঁকে রয়েছে রুদ্রতম ভ্রূকুটি, চোখের কালো কণীনিকাও রক্তের মত রাঙা।

তার মুখে আর জ্ঞানে যেন ছড়ানো রয়েছে অন্ধকার, বর্ণে আর চরিত্রে যেন কালিমা, বাক্যে এবং বপুতে—পরুষতা।

তাকে দেখে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলুম, ভেঙ্গে পড়লুম, তবু মিনতি করতে ছাড়লুম না। জিজ্ঞাসা করলুম

"ভদ্র, আপনি কে? কেনই বা আমাকে জাল দিয়ে বেঁধেছেন? যদি মাংসের লোভই হয়ে থাকে, যখন ঘুমিয়ে ছিলুম তখনি মেরে ফেললেই ত পারতেন। অপরাধ ত কিছু করিনি, তবে কেন দিচ্ছেন আমাকে বন্ধনদুঃখ? আপনার কাছে সেটা কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। খেলা ত হয়ে গেল। আমাকে মুক্তি দিন। আমাকে বহুদূর যেতে হবে; সেখানে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রয়েছে—আমাকে যারা ভালবাসে। আপনিও ত প্রাণী, আপনারও ত রয়েছে প্রাণ!"

সেই পুরুষটি পাখার মুখে মানুষের ভাষা শুনেও চমকিত হয়ে উঠল না। ধীর পরুষকণ্ঠে বললে

"মহাত্মন, আমি ক্রূর-কর্ম্মা, জাতিতে চণ্ডাল। মাংসের লোভে বা পাখী-ধরার আনন্দে আপনাকে আমি ধরিনি। সরোবরের ঐদিকে মাতঙ্গ-পল্লীতে বাস করেন আমার প্রভু পক্কণাধিপতি। তাঁর একটি ছোট্ট মেয়ে রয়েছে; সেই মেয়েরই এই সখ। কোথায় শুনেছে জাবালির আশ্রমে একটা শুকপাখী রয়েছে; হরেক রকম তার গুণ। কথা কয়। অমনি চাই সেই শুক। যেখান্ থেকে পারিস সত্বর নিয়ে আয় সেই শুক। চাইই চাই। হাজার লোক ছুটেছে, আমিও ছুটেছি। অনেক পুণ্যের ফলে আপনাকে আজ পেয়েছি। আমি ছেড়ে দেবার কে? সেই ছোট্ট মেয়েটির যদি ভাল লাগে, খাঁচায় পুরে রাখবে; পছন্দ না হলে কি যে করবে তা জানি না।"

তার কথা শুনে আমার মনে হল হঠাৎ যেন ইন্দ্রদেবের হাত থেকে বজ্র খসে

পড়ল আমার মাথায়। একি নিদারুণ কর্ম্মের ফের! পিতৃদেব যার ত্রিলোক-নমস্য মহামুনি শ্বেতকেতু, মাতৃদেবী যার স্বয়ং কমলা, দিব্যলোকের আশ্রমে যার নিত্যনিবাস,—সে কিনা আজ প্রবেশ করবে চণ্ডালের বাসভূমি একটা পক্কণে!—যে স্থানের ছায়া মাড়াতেও ঘৃণা করে ম্লেচ্ছরা। একত্র বাস করতে হবে চণ্ডালদের সঙ্গে! বুড়ো বুড়ো চণ্ডালদাসীদের হতে থেকে খাদ্য খেয়ে বাঁচতে হবে! হাতের খেলনা হতে হবে চণ্ডালশিশুদের! ওরে পুণ্ডরীক, কেন তুই জন্ম নিয়েছিলি? সেই জন্মের এই কি হল শেষ পরিণাম?

মায়ের নাম ধরে চীৎকার করে উঠলুম। আমাকে কি উদ্ধার করবি না? পিতার নাম ধরে চীৎকার করে উঠলুম। রক্ষা কর তোমার বংশের একমাত্র প্রদীপকে। রক্ষা কর।

চীৎকার করে কপিঞ্জলকেও ডাকলুম কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না।

পুনর্ব্বার সেই চণ্ডালকে মিনতি করে বললুম

"ভদ্র, আমি জাতিস্মর মুনি, এ সঙ্কটের সময় আমায় ত্রাণ করলে তোমার ধর্ম্ম হবে; যে সুখের মুখ জীবনে কখন দেখনি সেই সুখের হবে অধিকারী। আমাকে ছেড়ে দেবার সময় যদি কেঁউ দেখেও ফেলে তাতেও তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। আমাকে ছেড়ে দাও।"

এই বলে আমি তার পায়ে পড়লুম। সে শুধু হেসে আমাকে বললে "মোহে পড়ে চোখ দুটি একেবারে খুইয়েছেন। দেহের ভিতরে ইন্দ্র চন্দ্র করে পাঁচ পাঁচটি লোকপাল থাকা সত্ত্বেও যদি না দেখতে পান তাতে আমাদের দোষ কোথায়! আমার উপরে আদেশ রয়েছে, আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে।"

এই কথা বলে হাতের মুঠোর মধ্যে আমাকে ধরে চণ্ডালপল্লীর দিকে চলতে লাগল।

তার কথা শুনে আমি একেবারে হতাশ হয়ে গেলুম।

কৃষ্ণসর্পের মত বিষাক্ত ফণা তুলে এই যে নূতন বিপদ এল, বুঝতে পারলুম

না এ আমার কোন কর্ম্মের পরিণাম। দৃঢ়সংকল্প করলুম—আত্মহত্যাই এখন শ্রেয়ঃ।

মহারাজ, সেই চণ্ডালপল্লীর পরিবেশ যে কি ভীষণ তা বর্ণনা করে বলা যায় না। পাপের যেন একট সাজানো দোকান। দেখলেও যেন পাপ হয়।

কোথাও দেখি কতকগুলো চণ্ডাল—ভূতের মত তাদের চেহারা,—মাছ-মারার সিংহধরার জাল তৈরী করছে,

কোথাও দেখি চণ্ডালেরা ধনুক আর বর্শার ফলা পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত,

কোথাও দেখি বড় বড় ডালকুত্তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কেমন করে ধরতে হয় শিকার।

উলঙ্গ শিশুদের মৃগয়া-নৃত্য দেখতে দেখতে যতই পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলুম ততই বাঁশের-বেড়া-দেওয়া কুটিরসন্নিবেশের ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগল কাঁচা মাংস-পোড়ার দুর্গন্ধ। ক্রমে চোখে পড়তে লাগল পথের উপরে, পথের দুধারে হাড় আর কঙ্কালের অজস্র টুকরো। কুটিরগুলোর আঙিনায় খোঁটার উপর বড় বড় কাটা মাংসের পিণ্ড, সাদা সাদা চর্ব্বির চাপ। রক্তের নদী যে কত বয়ে চলেছে তা ভাবলেও শিউরে ওঠে গা।

মহারাজ, চণ্ডালদের সেই পল্লীটা দেখলেই নরক দেখার সাধ মেটে। কৃমি-কোশের কাপড়ে তারা লজ্জা ঢাকে, কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চামড়ার বিছানায় তারা ঘুমায়, রক্ত আর মৃত পশুর অর্ঘ্য দিয়ে দেবতার করে পূজা, আর মোষের পিঠে চড়ে মাংস খেতে খেতে মৃগয়া করে জীবন বইয়ে দিয়েই পায় সবচেয়ে বেশী আনন্দ। এদের পুরুষার্থ হচ্ছে স্ত্রী আর মদ্য, গম্যাগম্য অঙ্গনাতে উপভোগ এদের অনিশ্চিত, ব্যভিচার—প্রায় পুণ্যের সমান।

চণ্ডালপল্লীতে প্রবেশ করার মুহূর্ত্ত থেকে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল আমার আত্মা। মনের কোণে একটিমাত্র আশা পোষণ করে রেখেছিলুম—যদি চণ্ডাল-কন্যা দূর থেকে আমার দুর্দ্দশা দেখে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু যা হবার নয় তা কখনই হয় না। ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল আমার পুণ্যের সঞ্চয়।

'এই চণ্ডালপল্লীর মৃত্তিকাতে মুহূর্ত্তের জন্যও ছোঁয়াব না আমার পা'—এই কথা ভাবছি এমন সময় সেই পুরুষ চণ্ডাল দূর থেকেই মাথা নত করে চীৎকার দিয়ে উঠল "সেই শুকটাকে পেয়েছি মা, কি ভোগানই না ভুগিয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে একটি চণ্ডাল মেয়ে এসে দাঁড়াল। যেমন বিশ্রী তার চেহারা তেমনি বিশ্রী তার বেশ। একেবারে দুর্দ্দর্শন। একমুখ হেসে বললে "ভাল করেছিস্।" তারপরে সেই চণ্ডালের হাত থেকে যেন আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে ধরে আদর করে বললে "আরে বেটা এবার তোকে পেয়েছি, এখন কোথায় যাস্ দেখি। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান বের করছি।"

দেখতে দেখতে একটি চণ্ডালবালক সেখানে উপস্থিত হল। হাতে কাঠের খাঁচা, গরুর চামড়ার ঘেরাটোপ, ভিতরে কাঠের দুটি বাটি, একটিমাত্র দ্বার। দরজাটি একটিবার মাত্র খুলে, মহাশ্বেতাকে দেখবার দুঃস্বপ্নকে চিরদিনের মত বিলীন করে দিয়ে আমাকে বন্ধ করে রাখলে সেই খাঁচার ভিতর। পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতার মধ্য থেকে শুনতে পেলুম "ঐখানেই এখন সুখে থাক।"

একবার ইচ্ছে হল খাঁচার শিকে মাথা ঠুকে চীৎকার করে বলি "আমাকে ছেড়ে দাও," পরক্ষণেই মনে হল মুখ খুলে কথা কওয়া আমার পক্ষে ভাল হবে না। গুণ দোষ হয়ে দাঁড়াবে। 'বেশ কথা কইতে পারে"—স্বকর্ণে আমার কথা শুনে আমার উপর চণ্ডালকন্যার স্নেহ বৃদ্ধি পাবে; তাতে আমার বন্ধন বাড়বে বই কমবে না।

ও ত আমার ভ্রাতা বা বন্ধু নয়, যে ওর কাছে থেকে স্নেহ বা আত্মীয়তার ভদ্রতা আশা করতে পারি!

স্থির করলুম—মুখ খুলব না, মৌন হয়েই থাকব। নৃশংস জাতির মেয়ে, শঠতায় প্রকুপিত হয়ে বন্ধনের অধিক দুঃখও যদি আমাকে দেয় তাতে আমার লাভ বই লোকসান নেই। চণ্ডালের কথার সঙ্গে কথা মেশানোর চেয়ে মৃত্যু-দুঃখও ভাল। আমাকে চিরমৌন দেখে হয়ত ছেড়েও দিতে পারে। এটা ধ্রুব যে, কথা শুনলে আমাকে ছাড়বে না। আর কথা কয়েই বা করব

কি? দিব্যলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে ব্রাহ্মণ মর্ত্ত্যলোকে এসে জন্ম নিলে, তির্যকজাতিতে পতিত হয়ে চণ্ডালের হাতে হাতে ঘুরে যে পিঞ্জরের বন্ধনদুঃখ পেলে, সেই ব্যভিচারী ব্রাহ্মণের কি কথা কওয়া সাজে?

ইন্দ্রিয়সংযমের আশায় সেইদিন থেকে আমি মৌনব্রত গ্রহণ করলুম। আমার মুখে কথা-শোনবার অভিপ্রায়ে চণ্ডালেরা তাদের কুৎসিত ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। যখন দেখল কথা কয় না তখন তর্জ্জন করতেও ছাড়ল না। শেষে আমাকে আঘাত করে ব্যথা দিল, লোহার শলা দিয়ে লাগল খোঁচাতে। আমি কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলুম। কিন্তু একটি অক্ষরও বেরোল না আমার মুখ থেকে। জল নিয়ে এল, খাদ্য নিয়ে এল; ঠোঁট দিয়ে তা স্পর্শও করলুম না।

পরের দিন যখন অতিবাহিত হয়ে গেল আহারের সময় এবং আমি নির্জ্জীব হয়ে পড়েছি তখন সেই চণ্ডালকন্যা নিজে হাতে করে আমার জন্য নিয়ে এল নানান্ রকমের পক্ব অপক্ব ফল এবং সুরভি-শীতল পানীয়।

আমার মুখের উপর স্নেহগর্ভ দৃষ্টি ফেলে বললে

"ক্ষিদে পেলে যে পশুপাখীরা খায় না—এ অসম্ভব। হতে পারে আপনি জাতিস্মর ব্রাহ্মণ-শুক; ভোজ্যাভোজ্যের বিচার করেন। তবুও আপনাকে আহার করতে আমি অনুরোধ করছি। তার কারণ আপনি এখন আর ব্রাহ্মণ নন, বর্ত্তমানে পক্ষী-বিশেষ। পাখীদের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিবেক থাকে না। তার উপর আপদ্‌কালে যখন প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবার নিতান্ত প্রয়োজন ঘটে তখন বিধি আছে—খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ে নিয়মভঙ্গ। খাবেনই বা না কেন? চণ্ডালেরা যা খায় আমি ত তা আপনার জন্য আনিনি। ফল ত সকলের হাত থেকেই খাওয়া চলে। আর এ কথা কে না জানে চণ্ডাল যদি পাত্র থেকে মাটিতে জল ঢেলে দেয় সে জলও পবিত্র। কেন মিছে আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছেন? মুনিঋষিরা যে সব বন্য ফল আহার করেন আমি তাই নিয়ে এসেছি।"

চণ্ডালকন্যার মুখে চণ্ডালজাতির অনুচিত সোপদেশ পদাবলী শ্রবণ করে এবং

বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়ে গেলুম। পরিত্যাগ করলুম শাপনিঘ্ন ঘৃণা। পানাহার করলুম কিন্তু ত্যাগ করলুম না মৌনতা।

মৌনতার ভিতর দিয়ে একটি একটি করে কেটে যেতে লাগল দীর্ঘ দিন। যৌবনের সঞ্চার হল শুকদেহে।

তারপর হঠাৎ একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মিলে দেখি—আমি সোনার খাঁচায় বসে রয়েছি। সোনা হয়ে গেছে গরুর চামড়ার ঘেরাটোপ, সোনা হয়ে গেছে কাঠের দুটি বাটি, সোনা হয়ে গেছে খাঁচার শিক।

চণ্ডালকন্যাকে দেখে চমকে উঠলুম। তারও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই দুর্দ্দর্শন মেয়েটির আকৃতি মণ্ডিত হয়ে গেছে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে। ঠিক যেমনটি মহারাজ দেখলেন—

ইন্দ্রনীলমণিপুত্রিকার মত শ্যামা ঐ চণ্ডালকন্যা।

সমস্ত পক্কণদেশের বদল হয়ে গেছে—চেহারা। যেন দিব্যালোকের একটি অংশ। কুতূহলী দুটি নয়ন দিয়ে চেষ্টা করেও দেখতে পেলুম না চণ্ডালদের বাঁশের-ঝাড়ে-ঘেরা ধূমোদ্গারী কুটিরের সন্নিবেশ।

তারপরেই মহারাজের চরণপ্রান্তে আমাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

মহারাজ, এই মেয়েটি যে কে, কেনই বা নিজের পরিচয় দেয় চণ্ডাল বলে, কেনই বা আমাকে ধরল, কেনই বা এখানে নিয়ে এল—আমি নিজেই জানি না।

* * * *

বিহঙ্গরাজ বৈশম্পায়নের মুখে সমাপ্ত হল—মহতীয়ং কথা।

ফুলগন্ধে আমোদিত স্ফটিকমণির বেদিকায় কৌতুকভরে উঠে বসলেন রাজা শূদ্রক।

খড়্গ-বাহিনীর নবীন পদ্মদলের মত কোমল হাতের সংবাহন থেকে বিস্ময়ভরে সরিয়ে নিলেন নিজের চরণযুগ। পুরস্থিত প্রতিহারীকে ত্বরিত-আদেশ দিলেন "চণ্ডালকন্যাকে আহ্বান কর।"

অচিরেই চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ-সম্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করল প্রতিহারী।

চণ্ডালকন্যার দেহে কি অপূর্ব্ব অকলঙ্ক জ্যোতিঃ! চেয়েও যেন চাইতে পারলেন না মহারাজ শূদ্রক। দিক্‌দিগন্তকে প্লাবিত করে দিল সেই জ্যোতির শুভ্রতা। ক্রমবর্দ্ধমান সেই শুভ্রতার ভিতর থেকে প্রগল্‌ভকণ্ঠে কে যেন বলে উঠল

"শূদ্রক, তুমি রোহিণীর পতি। কাদম্বরীর তুমি নয়নের আনন্দ। পুণ্ডরীকের অভিশাপ-দিগ্ধ তুমিই সেই চন্দ্রদেব।

দুর্ম্মতি শুকের এবং স্বীয় আত্মার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস তুমি এখনি শ্রবণ করেছ। বর্ত্তমান জন্মে পিতার সনির্ব্বন্ধ নিষেধবাণীকে উল্লঙ্ঘন করে ভালবাসায় অন্ধ হয়ে এই শুক—বধূর কাছে চলেছিল;—সে কথাও শুকের মুখেই তুমি শুনেছ। আমি এই দুরাত্মার জননী—লক্ষ্মী। দিব্যচক্ষে পুত্রের এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার লক্ষ্য করে মহামুনি শ্বেতকেতু আমাকে আহ্বান করে বললেন 'অনুতাপ ছাড়া অবিনয়-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মের দোষে তোমার তনয়কে হয়ত তির্যকজাতির অপেক্ষাও নিম্ন স্তরে নামতে হবে। যতদিন না আয়ুষ্কর যজ্ঞের সমাপ্তি হয় মর্ত্ত্যে গিয়ে ওকে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা কর। যাতে অনুতপ্ত হয় সেইরূপ কাজ করাই বিধেয়।' সেইজন্যই আমি ওকে জালের বন্ধনী দিয়ে ধরে রাখিয়ে ছিলুম। এখন আয়ুষ্কর যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়েছে। সময় হয়েছে শাপাবসানের। অভিশাপের অন্তে তোমরা উভয়েই একসঙ্গে চিরসুখী হবে—তাই শুককে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমার চণ্ডালজাতিত্ব কেবল মানুষের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যে। দুঃখের শরীর ত্যাগ করে এমন তোমরা আনন্দ-লোকের নিত্যবাসী হও।"

এই কথা বলতে বলতে সেই জ্যোতির পরিধি ক্ষিতিতল ত্যাগ করে ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করতে লাগল। অনিমেষ চেয়ে রইল সেইদিকে বিস্ময়োৎফুল্ল কতকগুলি বাক্যহারা চক্ষু; আর গগনে গগনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল কনককঙ্কণের রণিত ঝঙ্কার।

লক্ষ্মীদেবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রকের মনে পড়ে যেতে লাগল জন্মান্তরের কাহিনী।

বিস্মরণীর কৃষ্ণকল্লোলিনীর বুকের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল যেন স্মৃতির অরুণ কমল।

বিহঙ্গ-রাজ শুককে শুধু শূদ্রক বললেন "সখা, তুমিই কি ছিলে আমার বৈশম্পায়ন পুণ্ডরীক ?"

তারপরেই আর কথা কইতে পারলেন না। অকস্মাৎ কোথা থেকে এসে তাঁর সমস্ত দেহকে নিস্পন্দ করে দিয়ে অন্তঃকরণের মধ্যে পদধারণ করলেন মকরকেতু।

আবির্ভূত হলেন পঞ্চশর, আকর্ণ আকৃষ্ট যাঁর কার্ম্মুক। শূদ্রকের নয়নসম্মুখে পরমাস্ত্র কাদম্বরীকে দাঁড় করিয়ে তিনি তাঁর জীবনধারণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন।

স্পন্দনহীনতার মধ্য দিয়েও শূদ্রক যেন অনুভব করতে লাগলেন কাদম্বরীর সান্নিধ্য।

পুষ্পবাণের আশঙ্কায় দেহটিকে পরিত্যাগ করে, বেরিয়ে যেতে লাগল অজড় দীর্ঘশ্বাসের পবন। গাছের পাতার মত থর থর করে কাঁপতে লাগল শূদ্রকের শরীর, মৃণালদণ্ডের মত কণ্টকিত হয়ে উঠল অঙ্গযষ্টি, পুষ্পশরের রেণুতে রেণুতে সজল হয়ে উঠল আঁখি।

হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে এল মুখের লাবণ্য। বেদনায় নয়নের তিন ভাগ এল মুদে।

ভিজে কাঠকে আগুনে পোড়ালে যেমন হয় তেমনি হল শূদ্রকের অঙ্গ ; ঝরে পড়তে লাগল ঘর্ম্মের ধারা।

একমুহূর্ত্তে প্রলয় ঘটে গেল শূদ্রকের দেহে।

সেই প্রলয়মুহূর্ত্তে—পুষ্পধনু যখন কাদম্বরীস্মৃতিকে সামনে দাঁড় করিয়ে বর্ষণ করছেন বাণ—তখন শিশির উপচারগুলিও সঞ্চিত অভিমানের অছিলায় ত্যাগ করল শূদ্রকের সান্নিধ্য।

যে চরণদুটির নিকট একদিন হার মেনেছিল রক্তপদ্মের কিশলয়, সেই কিশলয় আজ যেন বলে উঠল—"আমি ত হেরে রয়েছি, আর আমাকে কেন ?"

চোখ দুটিকে দেখিয়ে দিয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে বসে রইল নীলপদ্মের মালা। কপোল দুটিকে দেখিয়ে দিল মণিদর্পণ, হাসির প্রভাটিকে দেখিয়ে দিল ঘনসারের ধূলি। এরা যেন একবাক্যে বলে উঠল—"আমরা শূদ্রকের রূপশোভার সম্মুখে কখনও সগর্ব্বে দাঁড়াতে পারিনি, আজও পারব না। আমাদের ক্ষমা কর।"

রোগশান্তির যত রকমের প্রক্রিয়া থাকতে পারে সব রকমই করা হল; কিন্তু শূদ্রকের মদনভরালসী দেহের কিছুতেই ঘুচ্‌ল না নিষ্পন্দ ভাব।

ক্রমে প্রলাপ বকতে লাগলেন শূদ্রক।

সেই প্রলাপ-বাণীতে শুনতে পাওয়া গেল—কাদম্বরীর ধ্যান, তাঁকেই অভিলাষ, তাঁকেই দেখবার অপরিসীম আগ্রহ, তাঁরি সঙ্গে রসালাপ।

সেই প্রলাপের ভিতর দিয়েই চলতে লাগল—কাদম্বরীকে রাগিয়ে দেওয়া, রাগিয়ে দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেওয়া, বুকে নিয়ে তাঁকে মিনতি করা, শেষে কৃপণ পদপঙ্কজের সাধনা।

প্রলাপ যখন ছেড়ে যেত, তখন মুখ থেকে কথা বেরোতো না রাজা শূদ্রকের। দিনের বেলায় মুদ্রিত থাকত নয়ন, রাত্রে নয়নে নেই নিদ্রা। দীনমুখে ফিরে যেত বন্ধুর দল, লুপ্ত হত পৃথিবীর অস্তিত্বের জ্ঞান।

সুখ বলে কিছু ছিল না,
দুঃখ—তাও যেন নেই,
মৃত্যু—সে ত অমরতা।

এমনি করে অনুরাগের আগুনে পুড়তে পুড়তে একটি একটি করে কেটে যেতে লাগল শূদ্রকের দিন। বিফলে গেল পরিজনদের পরিচর্য্যা। শুষ্ক মুখ নিয়ে নিত্য তারা সেবা করে;—কিন্তু কোনও ফলই হয় না। বৈশম্পায়নের উপর

ক্রোধে আর বিরক্তিতে তাদের নিস্‌পিশ্‌ করতে লাগল হাত, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও তারা বলতে পারে না। ফল-হচ্ছে-না-দেখেও তারা নির্ব্বিচারে কাজ করে যেতে লাগল। আ-চরণ তারা ধুইয়ে দিত চন্দনের রসে, চরণতলে রেখে দিত আর্দ্র অরবিন্দের পাপড়ি, কর্পূরের চূর্ণ মিশিয়ে তুষারে মেজে দিত তাঁর হাত, কপোলে ধরে থাকত স্ফটিকমণির দর্পণ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ব্যর্থ হল ললাটতটে চন্দ্রমণির স্পর্শ, স্কন্ধদেশে মৃণালনালের শৈত্য, কুসুমতল্পের অভিনবা কল্পনা। ধারাগৃহে জলযন্ত্রের নব প্রবর্ত্তন করে, মাটির নীচে শীতল ভূগৃহ নির্ম্মাণ করে তারা ব্যাধি-শান্তির অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হল না। শূদ্রকের দেহ দিনদিন ক্ষীণ হয়ে নীরস কাষ্ঠের মত কঠিন নিষ্পন্দ হতে লাগল।

শূদ্রকের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীকাত্ম বৈশম্পায়নের সমান দশা হল —মহাশ্বেতার উৎকণ্ঠায়।

এমন সময়ে এল—ঋতু বসন্ত।
পঞ্চশরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরহাগ্নিকে দ্বিগুণিত করে দিয়ে সোৎসাহে দেখা দিলেন সুরভিমাস।

সরস কিসলয়-লতিকাদের নৃত্যলীলা শেখাবার উদ্দেশ্যে, চরণে নূপুর বেঁধে হঠাৎ নেচে উঠল উপদেশ-দক্ষ দক্ষিণ সমীর.

অশোকের শাখায় শাখায় শিউরে উঠল রক্তপল্লবের আলোলগুচ্ছ,

আর শিশুসহকারগুলি নত হয়ে পড়ল মুকুল-মঞ্জরীর স্নিগ্ধ-ভারে।
কিংকিরাত ফুলের সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনগাছে আগুন ধরিয়ে, দেখা দিলেন শ্রীবসন্ত।
বকুল তিলক চম্পকের সঙ্গে সঙ্গে কুরুবকের কোরক ফুটিয়ে,
উদ্দাম হয়ে উঠল কিংশুকবন, মাধবীলতার পরাগে গন্ধবিধুর হল দিগন্ত।

শ্রীবসন্ত এলেন—নিরঙ্কুশ করে দিয়ে কামিজনের চিত্ত, নির্ম্মূল করে দিয়ে মান, উচ্ছৃঙ্খল করে দিয়ে লজ্জা, বিদূরিত করে অনুনয়ের রীতি। হঠচুম্বন হঠআলিঙ্গন-হঠসম্ভোগের বিধান দিয়ে তিনি এলেন।

সমস্ত পৃথিবীতে, প্রাণীজগতে ছড়িয়ে পড়ল উৎসবের আনন্দ। সোনার পাতা দিয়ে কে যেন মুড়ে দিয়ে গেছে ধরণীকে, আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অনুরাগের বর্ণ, হাওয়ায় হাওয়ায় জাগিয়ে দিয়ে গেছে অরূপ প্রেমের উন্মাদনা। মধু খেয়ে মধুর হয়ে ছল কোকিলদের আলাপ—সেই আলাপ বিষ ঢেলে দিতে লাগল পথিকবধূদের কানে; আর বৃষ্টির মত ঝুম্ ঝুম্ ঝরতে লাগল আম্রমঞ্জরীর মকরন্দ; আতুর হয়ে উঠতে লাগল বিরহিনীদের মন—উড়ন্ত ভ্রমরের মাতাল ঝঙ্কারে।

মহাশ্বেতার আশ্রমে এসে দেখা দিলেন শ্রীবসন্ত—যিনি পঞ্চশরের অদ্বিতীয় সহায়, একমাত্র যিনি উল্লাসকারী।

আকুল হয়ে উঠল কাদম্বরীর হৃদয়।

সেদিন ছিল কামদেবের উৎসব। প্রকৃতির বাসন্তী ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে অনেক কষ্টে কেটে গেল তাঁর দিবাভাগ। তারপর সায়াহ্নে যখন শ্যামায়মান হয়ে উঠল দশদিক্, স্নান করে শুদ্ধচিত্তে তিনি সমাপন করলেন প্রদ্যুম্নপূজা।

প্রদ্যুম্নমূর্ত্তির সম্মুখে সুরভি-শীতল জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন চন্দ্রাপীড়কে, কস্তুরীবাসিত হরিচন্দনে বিলেপন করে দিলেন সর্ব্বাঙ্গ, কুন্তলকলাপে রচনা করে দিলেন আমোদি মালতীকুসুমের মালা।

চন্দ্রাপীড়ের একটি কানে সপল্লব রক্তাশোকের স্তবক দুলিয়ে কর্পূর ফুলের ঐশ্বর্য্য দিয়ে আভরণ বিরচন করে, বিস্মৃতিনিমেষ ভাবার্দ্র-দৃষ্টি, তাকে দেখতে লাগলেন—কাদম্বরী।

দেখা যেন আর ফুরোতে চায় না। উৎকণ্ঠার নির্ভরতায় ঘন ঘন পড়তে লাগল দীর্ঘশ্বাস। নুতনরকমের একটি লজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাঁর শরীর। ললাটে ফুটে উঠল সিন্ধুবারমঞ্জরীর মত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। কণ্টকিত তনু। শুষ্ক অধর।—উচ্চকিত দৃষ্টি।

চারিদিকে দেখতে লাগলেন কাদম্বরী। লুকিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে দেখছেনাতো মহাশ্বেতা! মনে কিসের যেন বাসনা। চন্দ্রাপীড়ের কাছে একবার এগিয়ে যান, আবার কি যেন কী মনে করে ফিরে আসেন। হঠাৎ নিজেকে মনে হল

আবিষ্টের মত; পায়ের তলা থেকে কে যেন সরিয়ে নিতে চায় মাটি। তারপরে অকস্মাৎ লজ্জার বাঁধ গেল ভেঙে; দূর হয়ে গেল অবলাদের সহজাতা ভীতি; উন্মাদকারী মন্মথের অসহ্য তাড়নায় হারিয়ে গেল তাঁর সর্ব্বস্ব। যখন আত্মস্থ হলেন তখন দেখলেন,—

মুদিতপদ্মের মত চন্দ্রাপীড়ের নয়নে কম্পিত অধরখানিকে মুদ্রিত রেখে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন কার প্রিয়াতিপ্রিয় কণ্ঠ!

•

কাদম্বরীর কণ্ঠাশ্লেষে কি যে ছিল তা জানি না, কিন্তু যেন অমৃতের উপচার পেয়ে সুদূরগত হলেও অকস্মাৎ পুনর্জ্জীবিতের মত কেঁপে নড়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের কণ্ঠ।

রৌদ্রক্লান্ত একটি কুমুদ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শরতের জ্যোৎস্নায়। ঊষার স্পর্শ পেয়ে যেমন করে খুলে যায় নীলপদ্মের পাপড়ি তেমনি ধীরে ধীরে খুলে গেল কর্ণায়ত চক্ষু। পদ্মের মত মুখ থেকে বেরল,—সৌরভের মত জৃম্ভা। অনেক দিনের পর স্বপ্নাতুর নিদ্রা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল চন্দ্রাপীড়।

জেগে উঠেই চন্দ্রাপীড় দেখল—চাঁপাফুলের গোড়ের মত দুখানি বাহু জড়িয়ে রয়েছে তার কণ্ঠ। বিরহ-দুর্ব্বল বাহু দিয়ে চন্দ্রাপীড় বক্ষে জড়িয়ে ধরল কাদম্বরীকে। পবন-সংহত শিশুকদলীর মত কেঁপে উঠল কাদম্বরীর অঙ্গযষ্টি—আনন্দিত আশঙ্কায়। পরমুহূর্ত্তেই বাতাসে মিলিয়ে গেল—শঙ্কা।

চোখ যেন মুদে আসতে চায়।
হৃদয় যেন মগ্ন হতে চায় হৃদয়ে।
—কে চায় মুক্তির দুঃখ?

এমন সময় কাদম্বরীর কর্ণে মধু ঢেলে দিল বহুপরিচিত একটি কণ্ঠস্বর:—

"ভীরু, ভয় কোরোনা। তোমার আলিঙ্গনেই আমি ফিরে পেয়েছি আমার প্রাণ। অমৃতজন্মা অপ্সরাদের কুলে তোমার জন্ম; আমাকে কি তোমার মনে পড়েনা? আমিই সেই চন্দ্রমা,—যে একদিন তোমাকে বলেছিল 'এই চন্দ্রাপীড়ের দেহ তেজোময়—অবিনাশী, বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শে

অক্ষয় হয়ে থাকবে।’ এতদিন যে তোমার হাতের স্পর্শ পেয়েও প্রাণ ফিরে পাইনি তার কারণ হচ্ছে—অভিশাপের অমোঘত্ব। শেষ হয়েছে আজ দ্বিতীয়বারের অভিশাপ। শূদ্রক-নাম নিয়ে যে মানুষী-তনু গ্রহণ করেছিলুম—সেই বিরহদুঃখদায়িনী তনুকে আজ পরিত্যাগ করেছি। এই তনুটিকে তুমি ভালবেসেছিলে, সেইজন্যেই আমি ফিরে এসেছি চন্দ্রাপীড়ের দেহে, তার দেহটিকেই নিজের বলে বরণ করে নিয়েছি। এখন তোমার চরণতলে বাঁধা রইল এই মর্ত্ত্যলোক, আর ঐ দূরের নক্ষত্রচন্দ্রের সাম্রাজ্য। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতারও যিনি প্রিয়তম, আমার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরও আজ শাপ শেষ হয়েছে॥”

চন্দ্রাপীড়ের দেহস্থিত চন্দ্রমার তখনও অবসিত হয়নি বাণী, এমনসময় দেখা গেল—কপিঞ্জলের হাতে হাত রেখে অম্বরতল থেকে পুণ্ডরীক নামছেন।

বেশভূষায় কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না।

মহাশ্বেতার উৎকণ্ঠায় উন্মাদ হয়ে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যে পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেই পুণ্ডরীকই তেমনই যেন নেমে এলেন।—প্রসিদ্ধ একাবলীর মালা তেমনি দুলছে তাঁর কণ্ঠে, আকল্পনিঃসহ তেমনি তাঁর দেহ, তেমনি কৃশ তাঁর দুখানি কপোল, তেমনি শুক্ল-পাণ্ডুর তাঁর মুখ।

কেবল চন্দ্রলোক থেকে নেমেছেন বলে অঙ্গে তাঁর অমৃতের সৌরভ।

দূর হতে তাঁদের দেখতে পেয়ে চন্দ্রাপীড়ের ভুজবন্ধন থেকে দ্রুত-মুক্তি নিলেন কাদম্বরী। আনন্দে দিশাহারা হয়ে ছুটে গেলেন মহাশ্বেতার নিকটে, জড়িয়ে ধরলেন তাঁর কণ্ঠ, কী যে বল্লেন তাঁর কানে কানে তা তিনিই জানেন, কিন্তু মহাশ্বেতার মুখে ফুটে উঠল মধুহাস্যের মহোৎসব।

শশাঙ্কাত্ম চন্দ্রাপীড়কে পুণ্ডরীক অভিবাদন জানাল। তাকে বুকে টেনে নিয়ে চন্দ্রাপীড় বললে—“সখা পুণ্ডরীক, প্রাগ্‌জন্ম-সম্বন্ধ-অনুসারে যদিও তুমি আমার জামাতা হও, তবু যেন ভুলে যেওনা পরজন্মে তুমি আমার সুহৃৎ, তুমি আমার ভাইয়ের মত ছিলে। তোমার আর আমার মধ্যে সেই সম্বন্ধই থাকবে চিরকাল।”

তাঁদের কথা শুনে স্থির থাকতে পারল না কেয়ূরক।
অবাঁধা রইল তার বীণার তার; কাদম্বরীর মনোরঞ্জনী বীণাখানিকে ফেলে রেখে সে ছুটে চলে গেল হেমকূটের পথে—যেখানে দুঃখে কালাতিপাত করেন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ আর হংস।
আশ্রম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মদলেখা। তখন জপে বসেছিলেন তারাপীড় এবং বিলাসবতী;—মৃত্যুঞ্জয়ের জপ। স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডটিকে চেপে ধরে মদলেখা তাঁদের চরণপ্রান্তে নিবেদন করল—আনন্দ-নির্ভর তার কণ্ঠ—"দেব, ভাগ্য ফিরেছে। বেঁচে উঠেছেন আমাদের যুবরাজ, ফিরেছে আমাদের বৈশম্পায়ন।"
ভুল হয়ে গেল তাড়াপীড়ের মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র-জপা; মদলেখা যে কাদম্বরীর নর্ম্মসহচরী এ বিবেচনাও গেল লোপ; দীর্ঘপলিত লোমশ সংস্কার-বিরহিত বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন মদলেখাকে। তারপরে হর্ষের প্রকর্ষে বিলাসবতীকে টানতে টানতে, স্কন্ধ থেকে খসে-পড়া উত্তরীয়ের অঞ্চলখানিকে সামলাতে সামলাতে, দৌড়তে দৌড়তে চলতে লাগলেন তারাপীড়; মুখে তাঁর একটিমাত্র প্রশ্ন "কোথায় সে, কোথায় সে।" ডেকে নিলেন শুকনাসকে। সঙ্গ নিল—শুকনাস মনোরমা, হাজার হাজার নরপতি।
দক্ষিণ মেরুর বাতাসে দুলে উঠল যেন পদ্মের সমুদ্র। মহাশ্বেতার আশ্রমে পুণ্ডরীকের কণ্ঠলগ্ন চন্দ্রাপীড়কে দেখতে পেয়ে প্রমোদ-পরতন্ত্রকণ্ঠে শুকনাসকে কটাক্ষে সম্বর্দ্ধিত করে তারাপীড় বললেন "আমি একলাই যে সুখী তা নয়; একবার চেয়ে দেখ।"

দূর থেকে মহারাজকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল চন্দ্রাপীড়, পৃথ্বীতলে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম করল পিতার চরণে। হাত ধরে প্রণত চন্দ্রাপীড়কে তুলে নিয়ে তারাপীড় বল্লেন
"চন্দ্রাপীড়, অভিশাপের ফলেই হোক্, নিজের পুণ্যের জোরেই হোক্, তোমাকে একদিন পুত্ররূপে পেয়েছিলুম। তবু আমি জানি, তুমি পুত্রই হও আর যেই হও, তুমি জগৎবন্দ্য লোকপাল চন্দ্রদেব। যিনি আমার নমস্য তিনি তোমাতে সংক্রামিত হয়েছেন। ভগবান চন্দ্রমা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

সকলে মিলে তখন চন্দ্রাত্মক চন্দ্রাপীড়কে করল প্রণাম।

আনন্দের অন্ত ছিল না বিলাসবতীর। চন্দ্রাপীড়কে তিনি বুকে টেনে নিলেন। একটিও কথা বেরল না তাঁর মুখ দিয়ে; কেবল চন্দ্রাপীড়ের মাথায়, গালে, কপালে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়তে লাগল অজস্রচুম্বন—আশীর্বাদী ফুলের মত।

আদর অভ্যর্থনা প্রণাম ও আশীর্বাদের অমৃতবৃষ্টিকে মধুরতর করে বিনয়নম্র পুণ্ডরীককে সকলের নিকট পরিচিত করিয়ে দিয়ে মনোরমা এবং শুকনাসকে চন্দ্রাপীড় বললে "এই পুণ্ডরীকই আপনাদের পুত্র বৈশম্পায়ন।"

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্য থেকে এগিয়ে এল কপিঞ্জল। শুকনাসকে অভিবাদন করে বললে "ভগবান শ্বেতকেতু আপনাকে এই কথা জানাতে আদেশ দিয়েছেন

'পুণ্ডরীক কেবল আমার দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হয়েছে কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ও আপনারই আত্মজ পুত্র। আপনাতেই লগ্ন রয়েছে ওর স্নেহ। একে বৈশম্পায়ন বলেই মেনে নিয়ে অবিনয় বা চপলতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। পরের ছেলে এই ভেবে এর সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন না। অভিশাপের শেষে পুণ্ডরীককে যে আমার কাছে নিয়ে এলুম না, তার একটি কারণ—পুণ্ডরীক আপনার। আর একটি কারণ হচ্ছে এই, যে চন্দ্রাপীড়ের কাছে থাকলে পুণ্ডরীক লাভ করবে চন্দ্রকালীন আয়ুঃ। সম্প্রতি আমার সম্বাখ্যজ্যোতিঃ দিব্যলোকেরও উর্দ্ধলোকে যাবার উদ্‌যোগে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।"

পুণ্ডরীকের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করে উত্তর দিলেন শুকনাস "কপিঞ্জল, বিশ্বের যিনি মনের খবর রাখেন তিনি কেমন করে এমন কথা বললেন! স্নেহের কি এমনিই ধারা—নিত্যই থাকে অপূর্ণ!"

জন্মজন্মের কাহিনী, অনুস্মরণ ও আলাপের মধ্য দিয়ে কখন যে সায়াহ্ন চলে পড়ল রাত্রির বুকে, জনসঙ্ঘের সুখোৎফুল্ল লোচনের দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে কখন যে হল রাত্রির অবসান, তা কেউ জানতে পারল না।

সকাল হতেই সকলে দেখতে পেল—গন্ধর্ব্বলোক থেকে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও হংস গৌরীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে সপরিজন আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

গুরুজনদের দেখতে পেয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে তাঁদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল মহাশ্বেতা আর কাদম্বরী। চারিদিকে ধ্মাত হল মঙ্গলশঙ্খ, বাঁশীতে বাঁশীতে বেজে উঠল মধুকর-মধুর তান, বীণায় বীণায় জাগল অনির্ব্বাণ ঝঙ্কার।

সহস্রগুণ মহোৎসবের উচ্ছলতায় তারাপীড় এবং শুকনাসের সঙ্গে আদান-প্রদান হল চিত্ররথ এবং হংসের বৈবাহিকী বাণী।

শেষে চিত্ররথ তারাপীড়কে বললেন "নিজেদের রাজ্য থাকতে অরণ্যের মধ্যে মহোৎসব করা কেন? আত্মার মিলনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় শ্রেষ্ঠ বিবাহ; তবুও লোকধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে লৌকিক বিবাহের একটি প্রয়োজন রয়েছে। চলুন আমাদের হেমকূটে, তারপরে সেখান থেকে উজ্জয়িনী হয়ে যাবেন চন্দ্রলোকে।"

তারাপীড়ের মুখে ফুটে উঠল পবিত্রতম একটি হাসি। তিনি বললেন "গন্ধর্ব্বরাজ, মাধুর্য্যসম্পদ্ যেখানে লাভ করা যায়—বন হলেও সেটা ভবন। এত সম্পদ এত সুখ কোথায় পাব? আমি ত আপনার জামাতাকে দিয়ে দিয়েছি আমার সর্ব্বস্ব। নিঃস্ব হয়েই আমি আজ সুখী। বয়স্য, চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরীকে নিয়ে আপনারা হেমকূটে যান।"

তারাপীড়ের অংশদেশ স্পর্শ করে চিত্ররথ বললেন "রাজর্ষি, আপনার অভিমতই আমাদের সম্পদ।"

হেমকূটে ফিরে গিয়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ চন্দ্রাপীড়কে সম্প্রদান করলেন— নিজের রাজ্য এবং কাদম্বরী। হংস সম্প্রদান করলেন পুণ্ডরীককে—নিজের প্রতিষ্ঠা এবং মহাশ্বেতা।

পরের দিন।

স্বজন পরিজনের মধ্যে ফিরে এসে সুখী হয়েছিলেন কাদম্বরী, সুখী হয়েছিলেন এতদিন পরে নিশ্চিত ফিরে পেয়ে জন্মজন্মান্তরের তাঁর প্রার্থনা— চন্দ্রাপীড়কে। কিন্তু কোথায় যেন মনের কোণে নখাঘাত করছিল একটি অশান্তি।

শেষে থাকতে না পেরে বিষণ্ণমুখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন চন্দ্রাপীড়কে

"আর্য্যপুত্র, আমরা সকলেই মৃত্যুদুঃখ পেয়ে শেষে একদিন ফিরে পেয়েছি আমাদের জীবন। মিলনও ঘটেছে। কিন্তু কি হল বরাকী পত্রলেখার? তাকে ত কই আমাদের মধ্যে দেখছি না? অজানা রয়ে গেল জন্মান্তরে কি যে হয়েছে তার।"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস, চন্দ্রাত্মক চন্দ্রাপীড় বললে "প্রিয়ে, সে ত এখানে নেই। পত্রলেখা—সে আমার তারাবধূ রোহিণী। অভিশাপের কথা শুনে দুঃখে দুঃখিনী হয়ে আমার কাছে এসে বল্লে—'হতেই পারে না, তুমি মর্ত্ত্যলোকে গিয়ে একলা দুঃখ সইবে—এ হতেই পারে না।' আমি তাকে অনেক বারণ করেছিলুম।—রোহিণী শুনল না আমার কথা, মর্ত্ত্যলোকে এসে আমার পরিচর্য্যার জন্যে জন্ম নেয়। তারপরে জানই ত, চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুর ঠিক পরেই কি রকম উন্মত্তের মত পত্রলেখা অচ্ছোদের জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবন দিয়েছিল বিসর্জ্জন। দ্বিতীয়বার আমি যখন শূদ্রকের কলেবরে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম নিতে আসি তখন দেখি রোহিণী—সেও মর্ত্ত্যলোকে নামছে। মধ্যপথে আমি তার গতিরোধ করে একরকম জোর করেই চন্দ্রলোকে তাকে ফিরে পাঠাই। সেইখানে আমার তারাবধূ পত্রলেখাকে তুমি দেখতে পাবে।"

বিস্মিত হলেন কাদম্বরী।

ভাবতে লাগলেন—

রোহিণীর উদারতা, মধুরতা, মহানুভবতা, পাতিব্রত্যের পেশলতা কী তার সৌন্দর্য্য!

তারপরে লজ্জায় নত হয়ে এল মুখ; মুখ থেকে বেরল না একটি বাণী।

সেই অবসরে প্রভু চন্দ্রমার দু-জন্মের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার অভিপ্রায়েই যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে বিদায় নিলেন দিবসভাগ। পশ্চিম সন্ধ্যাবধূর লজ্জাটিকে ঢেকে দিয়ে অনুরাগের বৈজয়ন্তী উড়াতে উড়াতে ছড়িয়ে পড়লেন বাসন্তেয়ী যামিনী।

মুগ্ধ হয়ে গেল সমস্ত বিশ্ব চন্দ্রোদয়ের ইন্দ্রজালে।

রজনীর পরিপূর্ণতার মধ্যে মিলন হল চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে কাদম্বরীর।

কবির সাধ্য নয় সে মিলনের, মিলনের সে উৎসুকতার, ঔৎসুক্যের সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা।

ধীরে ধীরে মুদে আসে নীলপদ্মের মত ছুটি আঁখি,
বারণ মানতে চায় না নির্দ্দয় হাতের মোহন অঙ্গুলি,
কখন না জানি শিথিল হয়ে যায় নীবির বন্ধন,
প্রত্যালিঙ্গনের তৃপ্তিহারা সুখ,
মিলনের সলজ্জ সমাপ্তি,—

এ বর্ণনার মধ্য দিয়েও কবি আভাস দিতে পারে না কাদম্বরীর সেই প্রথম মিলনের মাধুর্য্যরস।

দশরাত্রি কেটে গেল চন্দ্রাপীড়ের গন্ধর্ব্বলোকে—মোহময়ী একটি রজনীর মত।
তারপরে বিদায় নিয়ে, এল পিতার চরণপ্রান্তে।
পুণ্ডরীকের হাতে রাজ্যরক্ষার গুরুভার সমর্পণ করে,

কখনও জন্মভূমিস্নেহে উতলা হয়ে, শ্রেষ্ঠী প্রজাদের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করিয়ে—উজ্জয়িনীতে,

কখনও গন্ধর্ব্বরাজের সগৌরব মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—হেমকূটে,
কখনও অমৃতের সুরভি-শীতল রোহিণী-বহুমান—চন্দ্রলোকে,
পুণ্ডরীককে খুসী করে কখনও কমলার—কমলবনে
কখনও কাদম্বরীর সঙ্গে,
কখনও মহাশ্বেতা আর পুণ্ডরীককে সঙ্গে নিয়ে,
আনন্দের মন্দাকিনীতে স্নান করে,
নিত্যমিলনের মধ্য দিয়ে, কাদম্বরীর রুচি-অনুসারে,
রম্য হতে রম্যতর সেই সেই স্থানে বিচরণ-বিহারে,

দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে লাগল চন্দ্রাপীড়।

ভূষণভট্ট-কৃত কাদম্বরীর উত্তরভাগের সমাপ্তি

পরিশিষ্ট

শ্রীসোমদেবের কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশ নামক লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের অনুবাদ

* পুরাকালে কাঞ্চনপুরী (বিদিশা) নামে এক নগরীতে সুমনা (শূদ্রক) নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। একদিন তিনি যখন সভায় সমাসীন তখন প্রতীহার আসিয়া নিবেদন করিল 'মহারাজ, মুক্তালতা নামে এক নিষাদরাজকন্যা (চণ্ডালকন্যা) নিজ সহোদর বীরপ্রভের (চণ্ডালদারক) সহিত একটি পঞ্জরস্থিত শুককে লইয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আপনাকে দর্শন করিতে চাহে।' রাজা 'প্রবেশ করুক' বলিয়া আদেশ প্রদান করিলে সেই ভিল্লকন্যা রাজসভায় প্রবেশ করিল। তাহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সকলেই মনে করিলেন নিশ্চয়ই সে কোন দেবকন্যা, মানুষী নহে। ভিল্লকন্যা রাজাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল 'দেব, এই 'শাস্ত্রজ্ঞ' নামে (বৈশম্পায়ন) শুক চারিবেদে অভিজ্ঞ, কবি, সমস্ত বিদ্যা ও কলায় বিচক্ষণ। রাজার উপযুক্ত এই মনে করিয়া আমি ইহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।' প্রতীহার শুককে রাজার নিকট লইয়া আসিল। শুক রাজার উদ্দেশ্যে পরাক্রমসূচক একটি শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে বলিল 'মহারাজ, কোন্ শাস্ত্র হইতে কি বলিতে হইবে আদেশ করুন।' রাজা ইহাতে বিস্মিত হইয়া পড়িলে মন্ত্রী বলিলেন 'মহারাজ, মনে হয়, পূর্ব্বে এ কোন ঋষি ছিল, পাপবশতঃ শুক হইয়াছে। এ জাতিস্মর, ধর্ম্মবশতঃ পূর্ব্বে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিল তাহা এখন স্মরণ করিতেছে।' রাজা শুককে প্রশ্ন করিলেন 'ভদ্র, আমার কৌতুক হইয়াছে, তোমার নিজের বৃত্তান্ত বল, কোথায় তোমার শুকরূপে জন্ম, কোথা হইতে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান হইল, তুমিই বা কে ? শুক অশ্রুবর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল 'মহারাজ, যাহা বলিবার নহে তাহাও আপনার আজ্ঞায় বলিতেছি শ্রবণ করুন।'

'হিমালয়ের নিকটে (বিন্ধ্যাটবীতে) এক রোহিণীবৃক্ষ (শাল্মলীতরু) ছিল। তাহার দিগ্ব্যাপী শাখাসমূহ আশ্রয় করিয়া বহু পক্ষী অবস্থান করিত। তাহাতে এক শুকপক্ষী শুকীর সহিত বাসা করিয়া থাকিত। সেই শুক হইতে শুকীর গর্ভে আমার জন্ম হয়। জন্মের পরেই মাতার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ পিতা শাখার মধ্যে রাখিয়া আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিকটস্থিত শুকগুলির ভুক্তাবশিষ্ট ফল নিজেও খাইতেন আর আমাকেও দিতেন।

---

* শ্রীবাণভট্ট ও ভূষণভট্ট এই কাহিনীটিকেই "কাদম্বরী" কথাবস্তুতে রূপায়িত করেছেন।

একদিন তূর্য্য ও শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে এক ভয়ঙ্কর ভিল্লসেনা মৃগয়ার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। তাহাদের উপদ্রবে সমস্ত বন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। পুলিন্দবৃন্দ প্রাণিবধের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারা এত জীব বধ করিল যে, তাহাতে সেই বনভূমি কৃতান্তের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। শবরসৈন্য সমস্ত দিন মৃগয়া করিয়া ভারে ভারে মাংস বহিয়া আনিল। তাহাদের একটি বৃদ্ধ শবর কিছুই মাংস পায় নাই। সে সন্ধ্যার সময়ে ক্ষুধিত হইয়া সেই বৃক্ষের দিকে তাকাইল। তাহার পর সে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শুক ও অন্যান্য পক্ষিগণকে নীড় হইতে টানিয়া টানিয়া মারিয়া ফেলিয়া মাটিতে ফেলিতে লাগিল। যমকিঙ্করের ন্যায় তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া আমি ভয়ে লীন হইয়া আমার পিতার পক্ষপুটের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ইহারই মধ্যে সেই পাপী নীড় হইতে পিতাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার গ্রীবা ভাঙিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। আমি পিতার সঙ্গে পতিত হইয়া ভয়ে ভয়ে এক পত্ররাশির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বৃদ্ধ শবর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া মৃত পক্ষিগণের কতক অগ্নিতে পোড়াইয়া আহার করিল ও কতক লইয়া নিজের পল্লীতে গমন করিল।

প্রস্থানশেষে শান্তভয় হইয়া আমি সেই দুঃখদীর্ঘ রজনী যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে সূর্য্য উঠিলে তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় স্খলিত পদে নিকটবর্ত্তী এক পদ্মসরোবরের তীরে গমন করিলাম। সেখানে নিজের পূর্ব্বপুণ্যের মত মরীচি (হারীত) নামে কৃতস্নান এক মুনিকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার মুখে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল দিতে লাগিলেন, আমি ইহাতে আশ্বস্ত হইলাম। তিনি তখন আমাকে পত্রপুটে করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে কুলপতি পুলস্ত্য (জাবালি) আমাকে দেখিয়া হাসিলেন। অন্য মুনিগণ ইহাতে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন 'এই শুক শাপগ্রস্ত। আমি ইহাকে দেখিয়া দুঃখে হাসিয়াছি। আহ্নিক শেষ করিয়া তোমাদিগকে ইহার কথা বলিব। এ ইহা শ্রবণ করিয়া নিজের পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিবে।' ঋষি পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া আহ্নিক করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। আহ্নিক শেষ হইলে মুনিগণ আবার প্রার্থনা করিলে তিনি আমার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেন—

রত্নাকর (-উজ্জয়িনী) নামে এক নগরে জ্যোতিষ্প্রভ (তারাপীড়) নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তিনি সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে শাসন করিতেন। তাঁহার তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গৌরীপতির বরে হর্ষবতী (বিলাসবতী) নামে স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। দেবী হর্ষবতী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে সোম অর্থাৎ চন্দ্র তাঁহার মুখে প্রবেশ করিয়াছে, এই জন্য রাজা নিজের পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন সোমপ্রভ (চন্দ্রাপীড়)। রাজপুত্র সোমেরই মত নিজের অমৃতময় গুণে প্রজাবৃন্দের নয়নোৎসব বৃদ্ধি করিয়া বাড়িতে লাগিল। জ্যোতিষ্প্রভ পুত্রকে যুবা, বীর, রাজ্যভারবহনক্ষম দেখিয়া আনন্দিত হইয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আর প্রভাকর (শুকনাস) নামে নিজ মন্ত্রীর পুত্র সমগুণশালী প্রিয়ঙ্করকে (বৈশম্পায়ন) তাহার মন্ত্রী করিয়া দিলেন।

সেই সময়ে একদিন একটি অশ্ব লইয়া মাতলি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সোমপ্রভকে বলিলেন "আপনি ইন্দ্রের সখা বিদ্যাধর— মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন পুত্রস্নেহের বশবর্তী হইয়া ইন্দ্রদেব উচ্চৈঃশ্রবার পুত্র আশুশ্রবা (ইন্দ্রায়ুধ) নামক অশ্বরত্নটিকে আপনাকে উপহার দিতেছেন। এই অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া শত্রুদের অজেয় হউন।" এই বলিয়া সোমপ্রভ-কর্তৃক বিশেষরূপে পূজিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্রসারথি আকাশমার্গে আরোহণ করিলেন। সোমপ্রভের দিন কাটিতে লাগিল—উৎসব-মনোরম। শেষে একদিন সোমপ্রভ পিতাকে নিবেদন করিল—"অজিগীষুতা ক্ষত্রিয়দের ধর্ম নয়; আমাকে অনুমতি দিন আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হই।"

পুত্রের কথায় তুষ্ট হইয়া জ্যোতিপ্রভ অনুমতি দিলেন। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। আশুশ্রবায় আরোহণ করিয়া পিতৃদেবকে প্রণামান্তর বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত সোমপ্রভ বাহির হইয়া গেল। দুর্বারবিক্রম সোমপ্রভ সর্ব্বদিক্ জয় করিয়া মহীপতিদের পদানত করিল এবং বহু রত্ন ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করিল। শত্রুদের শিরোদেশের সঙ্গে সঙ্গে নমিত হইত তাহার ধনু, কিন্তু ধনুকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুশির উন্নত হইত না।

এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে হিমাদ্রির নিকটে আসিয়া সোমপ্রভ বিজয়-বাহিনীকে বিশ্রাম দিল।

সন্তরে একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছে এমন সময় সহসা সোমপ্রভের চোখে পড়িল মদভ্রখচিত একটি কিন্নর। ইন্দ্রদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে সোমপ্রভ কিন্নর ধরিতে ছুটিল। কিন্নরও প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এইরূপে সেনানিবাস হইতে বহুদূরে চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া সোমপ্রভ দেখিল সূর্য্য অস্তাচলে, সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রান্ত-দেহে চলিতেছে এমন সময় সোমপ্রভ একটি বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইল। সরোবরের তীরে রাত্রি কাটাইতে হইবে এই স্থির করিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া আশুশ্রবাকে তৃণোদক দিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল গীত-নিঃস্বন। কৌতুকাক্রান্ত হইয়া সঙ্গীতের অনুসরণ করিতে করিতে সোমপ্রভ দেখিল শিব-লিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া একটি দিব্যকন্যা গান গাহিতেছেন। এই অদ্ভুতরূপা দিব্যকন্যাকে দেখিয়া সোমপ্রভের বিস্ময় আর ধরে না। দিব্যকন্যাটিও সোমপ্রভের উদার আকৃতি দেখিয়া তাহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিল। 'কেমন করিয়া এই দুর্গমস্থানে আসিলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে সোমপ্রভ তাঁহাকে নিজের বৃত্তান্ত জানাইল। তারপর সাহসে ভর করিয়া দিব্যকন্যাকে প্রশ্ন করিল "আপনি কে, একাকিনী কেন এই অরণ্যে বাস করিতেছেন।"

দিব্যকন্যাটি তখন সজলচক্ষে গদগদকণ্ঠে নিজের কাহিনী বলিতে লাগিলেন—

"মহাভাগ, হিমাদ্রিকটকে কাঞ্চনাভ (হেমকূট) নামে একটি নগর আছে। সেখানে রাজত্ব করেন বিদ্যাধরদিগের ঈশ্বর পদ্মকূট (চিত্ররথ)। তাঁহার মহিষী হেমপ্রভাদেবীর

গর্ভে পুত্রাধিক প্রিয় একটি কন্যা জন্মে। আমি সেই কন্যা মনোরথপ্রভা (মহাশ্বেতা)। আমার বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ ছিল। সখীদের সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাহার পর দিবসের তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দ্বীপে, বনে, উপবনে, শৈলশিরে বিচরণ করিয়া পিতার আহারসময়ে বাড়ী ফিরিতাম। একদিন আমি এই সরোবরের তীরে বিচরণ করিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম একটি মুনিপুত্রক বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া তীরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম ; দূতী হইয়া তাঁহার শরণ লইলাম। তাঁহারও নয়নে আকূতি ফুটিয়া উঠিল। আমাকে স্বাগত জানাইলেন। আমি সেখানে বসিলে পর আমার সহচরী আমাদের দুজনকার চিত্তাশা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বয়স্যকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বয়স্য জানাইল—'সখি, এখান হইতে অনতিদূরে এক আশ্রমে দীধিতিনামা এক মুনি বাস করেন। সেই ব্রহ্মচারী একদা এই সরোবরে স্নান করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দেবী শ্রী অনঙ্গপীড়িতা হইলেন। তাঁহারই মানসজন্মা এই মুনিপুত্রক। দীধিতিকে পুত্র সমর্পণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হন। হৃষ্টমুনি পুত্রের নাম রাখেন রশ্মিমান্ (পুণ্ডরীক)। আমরা এখন এই তীরে বিহার করিতে আসিয়াছি।"

ক্রমে আমারও পরিচয় তাঁহারা পাইলেন। পরস্পরের পরিচয়ে আমাদের আলাপ ঘনীভূত হইল। মুনিপুত্রক এবং আমি সেইখানে অনেকক্ষণ বসিয়া আছি এমন সময় আমার দ্বিতীয়া সহচরী আসিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল—পিতার আহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি দ্রুত উঠিয়া গৃহে ফিরিলাম। আহারাদি সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়াছি এমন সময়ে আমার সখী আমাকে গোপনে লইয়া বলিল—

"মুনিপুত্রকের সখা আসিয়াছেন ; আপনাকে কিছু বলিতে চাহেন, প্রাঙ্গনদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। বলিলেন—'রশ্মিমান্ আমাকে মনোরথপ্রভার নিকট পৈতৃকী ব্যোমগমনী বিদ্যাবলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মদনদেবের কৃপায় প্রেয়সীর বিরহে তাঁহার এমন দশা হইয়াছে যে তাঁহাকে বোধ হয় আর বাঁচাইতে পারিব না।"

আমি রশ্মিমানের সখার সঙ্গে সঙ্গে এই সরোবরের তীরে ছুটিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি আমার বিরহে চন্দ্রোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে মুনিকুমারের মৃত্যু ঘটিয়াছে। নিজেকে ধিক্কার দিলাম, কত কাঁদিলাম : শেষে তাঁহার দেহ লইয়া একত্র চিতায় উঠিতেছি এমন সময় আকাশ হইতে একটি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া রশ্মিমানের দেহটিকে তুলিয়া লইয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন এবং বিহ্বল আমাকে আকাশবাণী করিয়া গেলেন—"মনোরথপ্রভা, এমন কাজ করিওনা। মুনিপুত্রের সহিত যথাসময়ে তোমার মিলন ঘটিবে।"

সেই হইতে মরণের চিন্তা ত্যাগ করিয়া শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়া আশায় হৃদয় বাঁধিয়া বাঁচিয়া আছি। মুনিপুত্রের সেই বয়স্য যে কোথায় চলিয়া গেছেন জানিনা ; এখনও তাঁর দর্শন পাই নাই।"

বিদ্যাধরীর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সোমপ্রভ জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন—আপনার সহচরী কোথায় গেল।"

বিদ্যাধরকন্যা বলিলেন—"সিংহবিক্রম নামে (চিত্ররথ) বিদ্যাধরদের এক রাজা আছেন। তাঁহার একটি অনন্যসমা তনয়া আছে—নাম মকরন্দিকা (কাদম্বরী)। সে আমার প্রাণের প্রাণ, সখী। আমার দুঃখে কাতর হইয়া বৃত্তান্ত জানিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার সখীকে এখানে পাঠাইয়াছিল। আমিও আমার সহচরীকে মকরন্দিকার নিকট পাঠাইয়াছি।" আলাপের মধ্যপথেই বিদ্যাধরী মনোরথপ্রভার সহচরী আকাশপথে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই রাত্রি সোমপ্রভ আশ্রমে পর্ণশয্যায় শুইয়া কাটাইয়া দিল। পরদিন প্রভাত হইলে দেখা গেল আকাশপথে দেবজয় নামে একটি বিদ্যাধর আসিতেছে। নমস্কার করিয়া সে নিবেদন করিল "দেবি, মহারাজ সিংহবিক্রম আপনাকে বলিয়াছেন—যতদিন না তোমার বর ফলবান্ হয় ততদিন তোমার সখী মকরন্দিকা তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তুমি আসিলে হয়ত তাহার মত পরিবর্ত্তন হইতে পারে।' আপনাকে মহারাজ মকরন্দিকার নিকটে যাইতে আদেশ দিয়াছেন।"

সোমপ্রভের কৌতুক বৃদ্ধি পাইল। বৈদ্যাধরলোক দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমাকে আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন—আশুশ্রবা আশ্রমেই তৃণোদক খাইয়া থাকিবে।"

সকলে দেবজয়ের সঙ্গে বৈদ্যাধরলোক গমন করিলেন।

অতিথিসৎকার করিয়া মকরন্দিকা মনোরথপ্রভাকে গোপনে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই সোমপ্রভটি কে ?"

বৃত্তান্ত বর্ণনার পর দেখা গেল—সোমপ্রভের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মকরন্দিকা হৃদয় হারাইয়াছে।

আর এ দিকে সোমপ্রভও মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর মত মকরন্দিকাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'হায় ইঁহার যিনি স্বামী হইবেন না জানি তিনি কত ভাগ্যবান'। তাহার পর আরম্ভ হইল দুই সখীতে কথালাপ। মনোরথপ্রভা মকরন্দিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'চণ্ডি, কেন তুমি বিবাহে অমত করিতেছ ? মকরন্দিকা উত্তর করিলেন—'সখি তুমি আমার শরীর অপেক্ষাও প্রিয়, তুমি বিবাহ না করিলে আমিই বা কেমন করিয়া বিবাহ করি ? মকরন্দিকার এই সপ্রণয় উত্তর শুনিয়া মনোরথপ্রভা কহিলেন—সখি, তুমি জান না, আমার বিবাহ হইয়াছে; কেবলমাত্র স্বামীর সহিত মিলনই আমার বাকি। আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। মকরন্দিকা মনোরথপ্রভার কথা শুনিয়া কহিলেন—'সখি, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।' অনন্তর মনোরথপ্রভা মকরন্দিকার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কহিলেন—'সখি, এই সোমপ্রভ দিগ্বিজয় উপলক্ষে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া তোমার অতিথি হইয়াছেন তুমি ইঁহার যথোপযুক্ত অতিথি-সৎকার কর।' মকরন্দিকা কহিলেন—সখি বেশী আর কি বলিব আমি আমার দেহটি এই

বিশিষ্ট অতিথির পূজার অর্ঘ্য করিয়া রাখিয়াছি, ইনি ইচ্ছামত গ্রহণ করুন। মকরন্দিকার এই কথা শুনিয়া মনোরথপ্রভা সোমপ্রভের প্রতি মকরন্দিকার অনুরাগের কথা তাঁহার পিতার নিকটে ব্যক্ত করিলেন এবং উভয়ে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সোমপ্রভও অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মনোরথপ্রভাকে কহিলেন—'দেবি, আমি এখন আপনার আশ্রমেই যাইব ; হয়ত আমার সৈন্যেরা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ পর্যন্ত আসিবে এবং আসিয়া যদি আমার সন্ধান না পায় তবে নিশ্চয়ই তাহারা আমার বিশেষ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ফিরিয়া যাইবে ; অতএব অনুমতি করুন আমি আমার সৈন্যগণের সংবাদ লইয়া যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসি। আসিয়াই শুভ লগ্নে মকরন্দিকাকে বিবাহ করিব।"

সোমপ্রভের কথা শুনিয়া মনোরথপ্রভা 'তথাস্তু' বলিয়া সোমপ্রভকে দেবরাজ নামক একজন গন্ধর্বের অঙ্কে আরোহণ করাইয়া নিজের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সোমপ্রভের মন্ত্রী মিখিল কুমারের অন্বেষণ করিতে করিতে মনোরথপ্রভার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কুমার তাহার নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই সময়ে রাজধানী হইতে পিতার সন্দেশ লইয়া একজন দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, পত্রে লেখা ছিল 'বৎস' সত্বর রাজধানীতে ফিরিয়া এস'। পত্রপাঠমাত্র সোমপ্রভ মন্ত্রীদিগের নিকট বিদায় লইয়া তখনই সসৈন্যে যাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন। আসিবার সময় দেবরাজকে বলিয়া আসিলেন -পিতা আমাকে রাজধানীতে ডাকিয়াছেন, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব। দেবরাজ গন্ধর্বনগরীতে ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ মকরন্দিকাকে বলিলে মকরন্দিকা সোমপ্রভের বিরহে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন,—কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না ; উদ্যানভ্রমণে রতি নাই, সখীসঙ্গ বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, মধুর সঙ্গীতধ্বনিও কর্ণে পীড়া দিতে লাগিল ; বসনভূষণের কথা দূরে থাক আহারেও জন্মিল অরুচি ; পিতামাতা অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কত উপদেশ দিলেন কিছুতেই মকরন্দিকা প্রবোধ মানিলেন না। কোথায় গেল সখীদের রচিত পদ্মপাতার শয্যা, মকরন্দিকা একেবারে উন্মাদিনী হইয়া ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতামাতার উদ্বেগের অবধি রহিল না। তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আশ্বাস দিলেন, সমস্তই নিষ্ফল হইল। মকন্দিকার অবাধ্যতা পিতামাতার স্নেহের সীমাকেও অতিক্রম করিল ; ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে কন্যাকে অভিশাপ দিলেন—'পাপীয়সী, নিষাদী হইয়া অতিঘৃণিত নিষাদ-সমাজে বাস কর, তোর দেহান্তর হইবে না বটে কিন্তু স্বজাতি-স্মৃতি একেবারে লোপ পাইবে।' অভিশপ্ত হইয়া মকরন্দিকা নিষাদ ভবনে পতিত হইলেন।

এদিকে মকরন্দিকার পিতা রাজা সিংহবিক্রম এবং মাতা উভয়েই কন্যার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বিদ্যাধর-রাজ সিংহবিক্রম পূর্বজন্মে ছিলেন একজন সর্বশাস্ত্রবিদ্ ঋষি। কিন্তু প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে এখন শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; ইহার পত্নীর জন্ম হইয়াছে শূকরযোনিতে। তপস্যার এমনই প্রভাব যে শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইঁহার শাস্ত্র-স্মৃতি পূর্বের মতই অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বৎসগণ, আমার হাসির কারণ অন্য কিছুই নহে,

শুধু ইহার কর্মফল দেখিয়াই আমি হাসিয়াছি। এই শুকই একদিন রাজসভায় আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মুক্তিলাভ করিবে এবং সোমপ্রভ পুনরায় অভিশাপমুক্ত হইয়া মকরন্দিকাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইবে। মনোরথপ্রভাও একই সময়ে সম্প্রতি রাজরূপে বর্তমান মুনিকুমার রশ্মিমানকে প্রাপ্ত হইবেন।

অধুনা সোমপ্রভ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং তথায় মনোরথপ্রভাকে দেখিতে না পাইয়া মহেশ্বরের আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন।" ভগবান পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া বিরত হইলে আমিও একে একে পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যিনি আমাকে তপোবনে আনিয়াছিলেন, সেই মরীচি মুনিই আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমার পক্ষোদ্ভেদ হইল, আমি অল্প অল্প উড়িতে শিখিলাম, এবং তির্যগ্‌জাতিসুলভ চপলতার বশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শেষে ব্যাধের হস্তে পতিত হইলাম। আজ আমার দুষ্কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়াছে, আমি এখন মুক্ত।'

সভার মধ্যে এই কথা বলিতে বলিতে শুকের দেহত্যাগ হইল। রাজা সুমনাও সেই বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন। এই অবসরে ভগবান্ ভবানীপতি সোমপ্রভের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করিলেন—বৎস, তুমি রাজা সুমনার নিকট গমন কর সেইস্থানে তুমি তোমার প্রিয়তমা মকরন্দিকাকে প্রাপ্ত হইবে। পিতার অভিশাপে মকরন্দিকা ব্যাধকন্যা হইয়া মুক্তালতা নাম ধারণ করিয়াছে। এবং তাহার পিতা শুকযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় সে তাহাকে লইয়া মহারাজ সুমনার নিকট গিয়াছে, তোমাকে দেখিবামাত্রই তাহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। মনোরথপ্রভাকেও ভগবান বলিলেন—বৎসে, তোমার প্রিয়তম মুনিকুমার রশ্মিমান্ রাজা সুমনারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তুমি রাজসভায় উপস্থিত হইবামাত্র তোমাকে দেখিয়া রাজার জন্মান্তরবৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ হইবে।' ভগবান্ মহাদেব, সোমপ্রভ ও মনোরথপ্রভাকে স্বপ্নে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারাও ভগবানের আদেশক্রমে মহারাজ সুমনার সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং সোমপ্রভকে দেখিবামাত্র মকরন্দিকার (বর্তমানে মুক্তালতা) লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সোমপ্রভ মকরন্দিকাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এদিকে মনোরথপ্রভাকে দেখিয়া মহারাজ সুমনার পূর্বের কথা মনে পড়িল। তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল এবং মুনিকুমার রশ্মিমানের মৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল। এইরূপে সোমপ্রভ মকরন্দিকাকে এবং রশ্মিমান্ মনোরথপ্রভাকে লাভ করিয়া পরম-পরিতোষের সহিত নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন।

পদটীকা ।

অঙ্কোল্ল ধূলি—বিষবৃক্ষ-বিশেষের রেণু ।

অগ্নিশৌচ অংশুক—অগ্নিতাপে পরিশুদ্ধ বস্ত্র ।

অন্বয় ব্যতিরেক—

অন্বয়—যে বস্তু থাকিলে আর একটী বস্তু থাকিতেই হইবে যথা—ধূম থাকিলে অগ্নি থাকিবেই ।

ব্যতিরেক—যে বস্তু না থাকিলে অন্য আর একটি বস্তু থাকে না যথা অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব ।

অনিচ্ছন্তী—নিমরাজী ।

অনাময় প্রশ্ন—কুশল জিজ্ঞাসা ।

অতিনির্হ্রাদ—কর্ণকঠোরধ্বনি ।

অমৃতকূর্চ্চ—অমৃতের তুলিকা ।

অগ্নিবিহার বেলা—হোম করিবার সময় ।

আকুতি—ইচ্ছা ।

উত্রাস—ভয় ।

উদ্ধূলিত—ধূলিমলিন ।

ঊরুদঘ্ন—ঊরুপ্রমাণ ।

কন্দর্প দীপক—কামরূপ প্রদীপ ।

কর্ণিকা—বীজকোষ ।

কর্ম্মান্তিক—ভৃত্য ।

ক্রেঙ্কার—রাজহাঁসের ডাক ।

কোককামিনী—চক্রবাকী ।

কোশস্পৃহা—ধনস্পৃহা ।

গব্যূতি—দুই ক্রোশ ।

গীর্ব্বাণপথ—আকাশ ।

ঘনসার—শ্বেতচন্দন ।

চন্দ্রাশ্রয়—মণিকোটা ।

চান্দ্রিক—চন্দ্রসম্বন্ধী ।

তামরস—পদ্ম ।

তিরস্করিণী—পরদা ।

দুঃখাসিকা—বেদনার কঠোরতা ।

নাড়ীন্ধম—নাড়ী কাঁপান।

পরিবন্ধক—সহিস।

পৌর্ব্বিকা—পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয়।

প্রেঙ্খোলিত—আন্দোলিত।

ভল্লক—অস্ত্রবিশেষ।

মাতরিশ্বা—বায়ু।

যামহস্তী—যে হস্তীকে প্রহরে প্রহরে বাহির করিয়া রাত্রির গভীরতা ঘোষণা করা হয়।

রজনীবিরামপিশুন—প্রভাত-সূচক।

রোধো জল—তটসলিল।

বলভীকপোত—ছাদের উপরিস্থিত পায়রা।

বস্তিকা—ছত্র।

বালসেবক—ছেলেবেলার চাকর।

বেপথু—কম্প।

শ্রোত্রশিখর—কানের মাথায়।

সাগ্রশতায়ু—একশত পঁচিশ বৎসর।